পুতুলরা কথা বললো

॥ ইন্দিরা দেবী ॥

॥ সিটি বুক এজেন্সী ॥
প্রকাশক ও পরিবেশক
৫৫, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

আমার

ছোট বন্ধু

'অনুরাধা'কে—

কোলকাতা

উপহার

কালো কুৎসিত কাফ্রি পুতুলটা কেমন করে একটা নীল রংয়ের কোট আর একটা চমৎকার টাই জোগাড় করেছে। ঢিলঢিলে পায়-জামা পরাই ছিল, তার সঙ্গে নীল কোট আর টাই ঝুলিয়েছে—মাথার চুলগুলো সোজা হয়ে আছে আর খুসীতে সাদা দাঁতগুলো আর ঢাকতেই চাইছে না। খেলাঘরময় ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে আর একবার করে খেলাঘরের ড্রেসিং টেবিলের আয়নার কাছে যাচ্ছে, ঘুরে ফিরে নিজের মুখ দেখছে আর আহ্লাদে আটখানা হয়ে ফেটে পড়ছে যেন—মনে মনে কখনও বা মুখ ফুটেই বলে ফেলছে: কী চমৎকার দেখাচ্ছে আমায়।

ওর রকম-সকম দেখে সাহেব পুতুল গম্ভীর হয়ে বসে আছে, অন্য পুতুলরা মুখ টিপে হাসছে, ছোটরা তো হেসে গড়াতে আরম্ভ

করেছে। পেট মোটা ভালুক সবাইকে ধমকাচ্ছে : এত হাসি কিসের বল তো? তোদের জন্য কেউ কিছু করবে না?

কোঁকড়া চুল নীল চোখ মেম পুতুল জোরে হেসে উঠলো : কিন্তু দেখছো কি ভালুক খুড়ো, সাজটা কি রকম হয়েছে? নীল কোট, টাই আর পায়জামা, মাথার চুলগুলো তো সোজা, চোখ দুটো মনে হচ্ছে ঠেলে বেরিয়ে এলো বলে—ঐ ভঙ্গিমায় আবার ঘন ঘন আয়নার কাছে যাওয়া হচ্ছে—ও কি ভাবছে ওকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে? কি করে হাসি চাপি বল? ভালুক একবার ঘাড় ঘুরিয়ে কুচ্ছিত পুতুলটাকে দেখে নিলে, সাদা দাঁত একটু বার করে মুচকি হাসলে, তারপর বল্লে : যাও যাও চা করগে, কখন সকাল হয়েছে এখনও এক কাপ চা পেলাম না। কি রকম যে সব ব্যবস্থা।

—চা তো রেডি। এসো তোমরা।

সকলে মিলে চায়ের টেবিলের কাছে গিয়ে দেখলে—এর মধ্যে কখন যে গিন্নি বৌ পুতুল সব ব্যবস্থা করে রেখেছে তা কেউ জানে না। গরম সিঙাড়া,—টোস্ট, বিস্কুট সব থরে থরে সাজানো টি-পটে চা ভিজছে।

—কই রে খরগোস, সকলকে ডাক—তোরাও আয়। ভালুক খুড়ো হাঁক দিল।

কান উঁচু করে চকচকে চোখ ঘুরিয়ে দু'লাফে খরগোস এসে বল্লে : আমি তো এখানেই খেলছিলাম। হাতী মেসো বলেছে যে, কাছাকাছি কোথায় লেটুস পাতা পাওয়া যায়, তাই শুনছিলাম। চায়ের কাপে দুধ দিয়ে নাড়তে নাড়তে মেম পুতুল বল্লে : খবর তো কিছু রাখো না, কালই এ বাড়ীতে লেটুস পাতা এসেছে, রত্নাদের চাকর কাল এনেছে বাজারের সময়, আমি খেলাঘরে বসে স্বচক্ষে দেখেছি। রত্নার দাদা কাল স্যালাড করতে বলেছিল ওর মাকে—মা তাই বলে দিল বিট, গাজর, আর যেন সব কি কি, লেটুস পাতা। চাকরটা ফিরে এসে বল্লে কি জানো, বল্লে সারা বড়বাজার, কলেজ ষ্ট্রীটে

লেটুস পাতা নেই, এটা আনতে তাকে নিউ মার্কেট যেতে হয়েছিল। তাই তো আমি সব শুনলাম। নিশ্চয় সব ফুরিয়ে যায় নি, ইচ্ছে করলে এক-আধটা যোগাড় করে নিতে পারো। এই বলে মেম পুতুল সকলের দিকে কাপশুদ্ধ চা এগিয়ে দিতে লাগলো।

সকলে যখন চা খাওয়া সুরু করেছে, এমন সময় কাফ্রি পুতুল এসে হাজির—কই আমার চা ?

সত্যিই তো যাকে নিয়ে এত আলাপ-আলোচনা তার চায়ের কথা একদম মনে নেই। কিন্তু একটাও তো আর কাপ নেই! একি হলো ? বারোটা কাপ আছে, কিন্তু গুণে দেখা গেল এগারোটা এগার জনে খাচ্ছে কিন্তু আর একটা কাপ নেই। মেম পুতুল বল্লে : তোমার পেয়ালা কোথায় ?

—আমি কি জানি ? কাল চা খেয়ে তো ঐখানেই রেখেছিলাম।

—তবে এটার দফা গয়া হয়ে গেছে নিশ্চয়—কার কাজ ? খরগোস—তোমার ?—খুড়ো হাঁকলো।

খরগোস ঘাড় নেড়ে বল্লে : নাঃ আমি—মোটেই না!

—তাহলে হাঁসগিন্নীর নতুন বাচ্চাটা কিংবা টমের কাজ। টমের বয়স আর বুদ্ধি হলে কি হবে ? খেলতে পেলে তো আর কিছু চায় না। কাপটাকে নিয়েই বলের কাজ করেছে হয়তো—ভারী গলায় হাতী মেসো বল্লে।

গিন্নী পুতুল বল্লে : যাইই হোক, পরে খোঁজ করলেই হবে, এখন কাফ্রি যা একটা কিছু নিয়ে আয়—চা খেয়ে নে।

—কি আবার আনবো, কোথায় কি পাবো ? ঐ ডিসটায় দাও যা হয় করে।—মুখ ভারী করে কাফ্রি পুতুল বল্লে।

—ডিসে করে খেতে গেলে তোমার জামায় পড়বে, জামাও যাবে, টাইও যাবে—তখন ?—চোখ মটকে হলদে ঠোঁট নেড়ে হাঁসগিন্নী বল্লে।

—সকলের খাওয়া শেষ হয়ে গেল—যা চট করে আন—গিন্নী পুতুল তাড়া দিল!

কাক্রি আর কি করে, খুঁজতে গেল। সকাল থেকে সে সেজেগুজে সকলকে দেখাচ্ছে আর নিজে গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়াচ্ছে, নিজের রূপ দেখে নিজেই খুসী হয়ে উঠেছে। আর এখন তাকে আবার চা খাবার পাত্র খুঁজতে হবে—আশ্চর্য্য! রাগ হলো খুব তার।

কিছুই পাওয়া গেল না, খুঁজতে খুঁজতে শেষে একটা প্লাষ্টিকের জিনিস পাওয়া গেল, সেটা রত্নার সেলাই-এর বাক্স থেকে। রত্না যখন সেলাই করে, আঙ্গুলে ওটা পরে নেয়।—বাস, আর কি, এতেই চা খাওয়া যাবে বেশ।

কিন্তু ভালুক খুড়ো ধমকে উঠলো, ঠিক যখন মেম পুতুল টি-পট থেকে চা ঢেলে দিয়েছে আর কাক্রি সেটা মুখের কাছে উঠিয়েছে। এমন সময় ভালুক খুড়োর ধমকানোর ভারী আওয়াজে চমকে উঠলো কাক্রি, কাপটা তো ছিটকে পড়লোই আর মাটির উপর যে চা পড়লো, তাতে পা পিছলে কাক্রিও চিৎপটাং হলো।

সত্যি খুব লেগেছে। উঁ, উঁ, উঁ—কান্না আর থামে না। পায়ে খুব লেগেছে।

—সকালবেলা কার মুখ দেখে উঠেছিস বলতো, না হলো চা খাওয়া, আবার ভাঙ্গলো ঠ্যাং—গিন্নী পুতুল এগিয়ে এসে কাক্রির চোখ মুছিয়ে, পা টেনে দিয়ে বলতে লাগলো।

—তুমি আর ওকে আদর দিওনা মাসী, সকালবেলা কাণ্ডখানা দেখ—তারপর রত্নার সেলাই-এর জিনিসটা কোথায় ছিটকে পড়লো খুঁজে পেলে হয়। এই সব, দেখ না তোরা! না যদি পাওয়া যায় রত্না কি ভাববে সেলাই করতে গিয়ে। তুমি ছেড়ে দাও মাসী, ও উঠুক, ওদের সঙ্গে খুঁজে দেখুক!

কাক্রি পা টেনে টেনে উঠলো আর শুধু ছোটরা নয়—ভালুক খুড়ো, হাতী মেসো থেকে বড়রা পর্যন্ত এদিক্ ওদিক্ খুঁজতে লাগল; কিন্তু কেউই তো দেখতে পাচ্ছে না কিছু।

অবশেষে কাক্রিই চেঁচিয়ে উঠলো : ঐ দেখা যাচ্ছে চিকচিক করছে।' সকলে মিলে ঝুঁকে পড়লো সেইদিকে, সত্যিই তো কাক্রি যা বলেছে ঠিক—ঐতো দেখা যাচ্ছে।

'কিন্তু ওখানে তো আমার হাত পৌঁছবে না, কি হবে?

খেলাঘরের সাদা ইঁদুরটা ছুটে এলো—কিচকিচ করে বল্লে : পাবে কি করে, ও তো আমাদের গর্তের মধ্যে গিয়ে পড়েছে।

—দাও না ভাই দয়া করে এনে—কাক্রি বলে উঠলো।

—অবশ্যই এনে দেবো, কিন্তু তুমি আমায় কি দেবে?

—যা বলবে, যা বলবে—চেঁচিয়ে বলে উঠলো কাক্রি।

গলার আওয়াজটা নরম করে ইঁদুর বল্লে : কিন্তু আমি চাইছি তোমার গলার ঐ সুন্দর টাইটা—দেবে তো?

—কখনও না—চীৎকার করে উঠলো কাক্রি পুতুল। তারপর গজরাতে গজরাতে বললে : জানো এটা কত দামী আর কত সুন্দর এরকমটা কারুর নেই।

—বেশ, বেশ, তুমিও যখন ওটা দিতে পারবে না, আমিও তোমার কাজ করতে পারবো না, চললুম।

ইঁদুর তো চলে গেল কিন্তু কাক্রির অবস্থাটা মনে করো তো একবার। সব পুতুলরা এসে ঘিরে ধরলো তাকে—আর বকুনী আরম্ভ হলো।

—কাক্রি এরকম করলে এ খেলাঘরে কি আর থাকতে পারবে? —মেম পুতুল বল্লে।

—তাছাড়া এরকম স্বার্থপর হলে তো চলবেই না—হাতীর মোটা গলার আওয়াজ।

—আমরাই বা এরকম বরদাস্ত করবো কেন? রত্নার জিনিসটা হারিয়ে যাবে, আমরা তার বন্ধু হয়ে কিছু করতে পারবো না, এটা একটা কথা হলো!—সেপাই বল্লে।

—কী বলছে কাক্রি, টাইটা ওকে দেবে না?—গিন্নী পুতুল বল্লে।

—ওসব রেখে দাও, ইঁদুরকে দিয়ে ওটা তোলাতেই হবে, তার জন্য কাক্রিকে যা হয় দিতে হবেই। কাক্রি!—ভালুক খুড়ো জোর দিয়ে ডাকলো।

কাক্রি আস্তে আস্তে এসে দাঁড়ালো: কি বলছো খুড়ো?

—রত্নার সেলাই-এর বাক্স থেকে ওটা বার করেছিলে কেন? ওটা হারালে এখন কি হবে? ও আমাদের এত ভালবাসে আর তুমি স্বার্থপরের মত কি করছো? ইঁদুর কি বলছে—তুলে দেবে না?

—ও যে টাইটা চাইছে, আমার খুব পছন্দ—

ধমকে উঠলো ভালুক খুড়ো: তাহলে রত্নার ওটা উদ্ধার হবে না, তুমি ভারী স্বার্থপর তো হে ছোকরা!

গিন্নী পুতুল বল্লে: দে বাবা দে, আবার কত টাই পাবি, রত্না তো রোজই আমাদের জন্য জামাকাপড় তৈরী করছে, কত টুকরো পড়ে থাকে, আমি তোকে একটা টাই তৈরী করে দেবো।

হাঁসগিন্নী আপনমনে বলতে লাগলো: সকালবেলাই আজ কি বিভ্রাট রে বাবা! আর নিজের জাতীয় পোষাক ছেড়ে, পরের দেশের টাই-এর ওপর এমন সৃষ্টিছাড়া লোভ তো কখনও দেখিনি।

কাক্রি অবশেষে রাজী হলো—আর তখনি ইঁদুর গর্তে গিয়ে মুখে করে ওটা আনলো।

সকলে আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলো আর খরগোস সেটা মুখে করে নিয়ে গিয়ে চট করে রত্নার সেলাই-এর বাক্সে রেখে দিয়ে এলো।

কাক্রি এককোণে গিয়ে নাক ফুলিয়ে আপন মনে বলছে: আমার মত দুঃখ তো কারুর হয়নি, তাই এত আনন্দ হচ্ছে সব। আমার অমন টাইটা—

ভালুক খুড়ো ডাক দিল: কাক্রি, এদিকে এসো।

কাক্রি ভয় করে কেবল খুড়োকে আর ভালবাসে গিন্নী পুতুলকে। খুড়ো, হড়াতাড়ি এসে দাঁড়াতেই ভালুক বল্লে: কি হয়েছে? মুখ কিন্তু কেউ

কালো করছো কেন? টাইটা খুলে তোমায় কত সুন্দর যে দেখাচ্ছে, যাও আয়নায় গিয়ে দেখগে।

কাফ্রি তখন হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ রগড়াচ্ছে। কান্না-ভেজা গলায় বল্লে: আমার টাই ছাড়া কেউ আমায় পছন্দ করবে না?

—কে বলেছে? হুঙ্কার দিয়ে উঠলো হাতী—দেখগে কি রকম দেখাচ্ছে সুন্দর তোমায়।

—তাছাড়া, তুমি এই রকম স্বার্থত্যাগ করেছো বলে আজ তোমার জন্যে আমরা একটা চায়ের আসরের ব্যবস্থা করেছি—যাও চোখ মুখ ধুয়ে এসো টেবিলে—ভালুক খুড়ো সান্ত্বনার সুরে বল্লে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সকলে এসে চায়ের টেবিলে জড় হলো। কাফ্রির মুখ তখন ফোলা ফোলা, দূরে দেখা যাচ্ছে টাইটা গলায় ঝুলিয়ে ইঁদুর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখছে আর হাসিতে ফেটে পড়ছে।

গিন্নী পুতুল আপন মনে বলে উঠলো: আহা, দেখে আর বাঁচিনা, সখ করে তো নেওয়া হলো, কালকের মধ্যেই তো কুট কুট করে কেটে ফেলবে—তার আবার অত।

কিন্তু চায়ের আসর জমিয়ে তুললো মেম পুতুল, খরগোস টম, সেপাই, হাঁস-গিন্নীর ছেলেমেয়েরা। ভারিক্কী চালে ভালুক খুড়ো আর হাতী মেসো বসে রইল—একটু একটু হাসছিলও—

বেশ কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল। কালো মুখে সাদা দাঁত বার করে কাফ্রি খুব হাসছে—আর গিন্নী পুতুলের তৈরী গোকুল পিঠে নিয়ে খরগোসের সঙ্গে মারামারি করছে।

হাতী আর ভালুক দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে গলা নামিয়ে বল্লে: চল হে, ঠিক হয়ে গেছে।

* * * *

হ্যাঁ, এবার চায়ের আসরে বারোটা কাপই পাওয়া গেল সে-খবরটা দেওয়া হয়নি।

সেদিন রাত্তিরে

ব্যাপারটা ঘটলো শিউলির খেলাঘরে।

দিদু যদি শিউলিকে ঐ চমৎকার পুঁতির বাক্সটা উপহার না দিতেন তাহলে হয়তো এমনটি হতো না। পুঁতির বাক্সটা দেখতেই শুধু ভালো তাতো নয়,—ডালাটা তুলতেই ভিতরে কত রং বেরং এর চোখ ঝলসানো চকচকে রকমারী পুঁতি। প্রথম দিন শিউলি ওটা পেয়ে খুসীতে দিদুর কোলের উপর শুয়ে পড়লো আর বল্লে; কি চমৎকার বাক্স দিদু, তুমি শোভনকে যে খেলাটা দিয়েছ তার চেয়ে অনেক ভালো। কিন্তু হলে কি হয়, দু'দিন যেতে না যেতে বাক্সর ওপর আর কোনো আকর্ষণ রইল না। খেলাঘরে পড়ে রইল—না হলো মালা গাঁথা না হলো পুতুলের গলায় নেকলেস পরানো।

সেদিন যখন রাত্রি হলো—খেলাঘরের পুতুলদের সকাল হয়েছে সবাই জেগে উঠেছে। খেলাঘরে দিদু আর ঠাকুমার জন্য শিউলির কোনো অভাব নেই পুতুলের। কত পুতুল চাও বলো, সভা জমিয়ে

বসে আছে তারা। সাদা খরগোস ঝুটো মতির চকচকে চোখ বার করে সব দিকে ঘুরছে, ফিকে হলদে রংএর রেশমী হাতী, কালো ভালুক—কি রাশভারী, সবাই তাকে ভয় করে হাঁসটাকে একেবারে জীবন্ত বলে ভাববে তাছাড়া কান উঁচু করে কুকুর, বেড়াল এসব তো আছেই। ডলিটা চালবাজ, সেজে গুজে বসে থাকে—আর আছে কালো কুচ্ছিত কাফ্রি পুতুলটা। একেবারে জম জমাট ঘর সংসার—মিলে মিশে থাকে সবাই। অল্প সল্প ঝগড়াঝাঁটি না হয় তাও নয়—কিন্তু তবুও সব আছে একসঙ্গে। সেদিন হয়েছে কি—ঐ কালো কুচ্ছিত কাফ্রি পুতুলটার মনে কি মতলব এসেছে বা লোভ হয়েছে—সে কাউকে কিছু না বলে শিউলির সেই চমৎকার পুঁতির বাক্সটা পেড়ে এনেছে। তারপর তার ঢাকা খুলে অবাক হয়ে দেখছে। এরকম ঐশ্বর্য্য সে আর জীবনে দেখেনি। মাথার চুলগুলো সোজা হয়ে উঠেছে আর চোখ দুটো এমন বড় করেছে যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে—বাক্সর ডালাটা তুলে একমনে দেখছে—এমন সময় সেখানে এলো । তার পোষাক বেশ চকচকে, চুলের রিবণ থেকে আর পায়ের জুতো পর্যন্ত কোথাও এতটুকু ধূলো নেই! ডলি এসেই বল্লে, অমন হাঁ করে কি দেখছিস? কাফ্রির মুখখনা আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সাদা সাদা বড় দাঁতগুলো বার করে একগাল হেসে বল্লে; দেখ দেখ ডলি, কি চমৎকার জিনিসগুলো। শিউলি অনেকদিন ধরে ফেলে রেখেছিল, আমি নামিয়ে এনেছি। কিরকম চকচক করছে যেন সত্যিকারের চুনী পান্না।

ডলি ঠোঁট উল্টে বললো; হ্যাঁ ঐ আবার ভালো পুঁতি নাকি? সে ছিল আমার মাসতুত বোনের পিসতুত দিদির খুড়তুত বোনের খেলাঘরে, তুই যদি দেখতিস অবাক হয়ে যেতিস। পুতুলের জন্মে এমন জিনিস তুই আর যে দেখিসনি তা আমি বলতে পারি।

কাফ্রি পুতুল বল্লে: তা হোক্ ভাই ডলি এগুলোও খুব ভালো। দেখ দেখ বড় লাল পুঁতিগুলো থেকে যেন লাল আলো ঠিকরে আসছে।

ডলি বল্লে: ও কি দেখছিস, সে ছিল আমার দিদির—কোথা থেকে খরগোসটা ছুটে এসে পুঁতির লাল চোখ ডলির দিকে উঁচু করে বল্লে: হ্যাঁ হ্যাঁ বল ডলিদিদি, সে ছিল তোমার পিসতুত ভায়ের মামার দাদা মশায়ের—

বাধা দিয়ে গিন্নী পুতুল বল্লে: এই বাচ্চু, তুই কিন্তু বড্ড পেছনে লাগিস। ঐ জন্য ডলি তোকে দেখতে পারে না।

খরগোস বল্লে: আমি যে ডলিদির চালের কথাগুলো জানি, বাবাঃ এত রকম মাসতুত ভাই আর পিসতুত বোনের খেলাঘরের খবর ডলিদির কাছে পাওয়া যায় যে শুনে শুনে আমি বলে দিতে পারি ডলিদি এরপরই কি বলবে।

ডলি টান হয়ে উঠে দাঁড়ালো—রেগে বল্লে: দেখ বাচ্চু ছোট আছিস বলে কিছু বলছি না, নাহলে—

বাধা দিল আবার খরগোস, ছোট একটা লাফ দিয়ে আদরে গলে বল্লে: না হলে কি হতো ডলিদি' তোমার মাসতুত ভায়ের মামাত বোনের খুড়তুত দাদার পাড়ার যে বোন ছিল—

ডলি ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো; বাচ্চু ভালো হচ্ছেনা বলছি। কাফ্রি ব্যস্ত হয়ে বল্লে: আহাহা কি যে ঝগড়া করো তোমরা, যাও বাচ্চু, এখনি ভালুক মেসোকে বলে দেব—বুঝবে তখন।

বাক্সটা হাতে করে কাফ্রি পুতুল উঠতে যাবে এমন সময় খরগোস তার হাত থেকে বাক্সটা নিয়ে দেখতে যাবার চেষ্টা করতেই হাত ফস্কে সেটা পড়ে গেল মাটিতে—আর পুঁতিগুলো ছড়িয়ে ছিটকে পড়লো চারদিকে, কতকগুলো গড়াতে আরম্ভ করলো।

দেখলে তো কাণ্ডটা? চীৎকার করে উঠলো কাফ্রি পুতুল। সকলে ছুটে এলো চীৎকার শুনে—আর ব্যাপারটা বোঝবার আগেই হাঁসগিন্নী তার লম্বা হলদে ঠোঁট দিয়ে টুক টুক করে তুলতে আরম্ভ করে দিল।

ভালুক মশাই, হাতী ভায়া সকলে দল বেঁধে এলো: কি কাণ্ড করেছে কাফ্রি, কি দরকার বাক্সতে হাত দেবার?

কাক্রি তখন ভয়ে জড়সড় হয়ে সব পুঁতিগুলো পাওয়া গেল কিনা দেখতে আরম্ভ করেছে। বকুনী খেতে খেতে সে গুণে দেখলো সবই পাওয়া গেছে প্রায়, কেবল সেই বড় লাল চকচকে পুঁতি একটা পাওয়া যাচ্ছে না।

খরগোস খবর দিলে সেটা ইঁদুরের গর্তে পড়েছে সে স্বচক্ষে দেখেছে।

আরো কতকগুলো বকুনী খাওয়া কাক্রির অদৃষ্টে ছিল কি আর করবে সে। সকলে মিলে প্রাণভরে বকুনী দিল আর চুপচাপ করে সে বকুনীগুলো হজম করতে হলো। ভালুক মশাইএর তর্জন গর্জন, হাতীর দাপাদাপি, ডলির টিপ্পনী সবই নিঃশব্দে কাক্রি পুতুলকে হজম করতে হলো। কি আর করবে বল। কেবল গিন্নী পুতুল বলছিল, ছেলেমানুষ পুঁতির বাক্সটা বার করেছে তাতে আর অত বকাবকি করে কি হবে। এমন একটা কাণ্ড ঘটবে তাতো আর বুঝতে পারেনি। হাঁসগিন্নী প্যাঁক করে তা সমর্থন করে বল্লে: সবই তো পাওয়া গেছে, কেবল একটা পুঁতি গড়িয়ে গেছে—তার জন্য যথেষ্ট হয়েছে আর কেন?

পুঁতির বাক্স তুলে রাখা হলো, ক্রমশঃ বকুনীও বন্ধ হলো, যে যার কাজে মন দিল। কেবল কাক্রি পুতুল মন আর মুখ ভারী করে জানালার রেলিংএ মাথা দিয়ে বাইরে মাঠের দিকে চেয়ে রইল।

সারা মাঠ জ্যোৎস্নার আলোয় ভরে উঠেছে, দিনের আলোর মত স্পষ্ট সব দেখা যাচ্ছে। গাছপালা সামনের দিকে যা ছিল তা ছাড়িয়ে অনেক দুর পর্যন্ত, যত দূর দেখা যায় কাক্রি তাকিয়ে রইল।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেছে—হঠাৎ যেন কোথা থেকে কান্নার আওয়াজ শোনা গেল—হুঁ হুঁ হুঁ করে মিহি গলায় কান্নার আওয়াজ, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, কোথা থেকে আসছে।

শুধু একলাই কাক্রি পুতুল শুনেছে তা নয়—পুতুল গিন্নী আর হাঁসগিন্নী এসেও জানালার কাছে দাঁড়ালো—'কিরে কাক্রি কি হয়েছে, কে কাঁদছে?'

কাক্রি এদিক ওদিক তাকিয়ে বল্লে : কান্না শুনতে পাচ্ছি কিন্তু কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না কোথাও।

কিন্তু কান্নার শব্দ থামল না—এক ভাবেই শোনা যেতে লাগলো।

এক এক করে জানালার কাছে সবাই এসে দাঁড়ালো—'নাঃ কই কাউকে দেখা যাচ্ছে না'। তারপর সকলে বেরিয়ে পড়লো মাঠে—। খরগোস ছুটে ছুটে একটা গাছের তলা থেকে চেঁচিয়ে উঠলো, ওমা এই যে এখানে দাঁড়িয়ে কান্না হচ্ছে। কে গো তুমি ?

হাঁসগিন্নী বল্লে : ওমা এতো পরীর মেয়ে, কি হয়েছে ? ফোঁপাতে ফোঁপাতে পরী বল্লে : গলার নেকলেস হারিয়ে গেছে যে ! কি হবে, কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। গিন্নী পুতুল বল্লে : তা কেঁদে কি হবে, কাঁদলে কি খুঁজে পাবে, তার চেয়ে এসো আমাদের ঘরে, দেখছি আমরা কি করা যায়।

হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ মুছলো সে, পাখা দুটো তখন ঝির ঝির করে কাঁপছে, চাঁদের আলো লেগে ঝিকমিক করছে। হাঁসগিন্নী হলদে ঠোঁট দুটো ফাঁক করে অবাক হয়ে দেখছে। ভালুক মেসো, পেট মোটা হাতী, চালবাজ ডলি সকলেই বেরিয়ে এসেছিল আর চোখ বড় করে অবাক হয়ে দেখছিল।

—হুঁ হুঁ হুঁ আমার নেকলেস না পেলে মুস্কিল হবে, সেখানে যাওয়া হবে না ! পরী তখনও বলছে আর কাঁদছে।

—'কেঁদো না লক্ষ্মী মেয়ে, দেখছি তো আমরা কি করতে পারি, তোমার নাম কি ? খুব মিষ্টি চেহারা তো !' হাঁসগিন্নী বল্লে !

ফোঁপাচ্ছে তখনও সে, তারপর নাক টেনে বল্লে : আমার নাম ঝিলমিল। মা আদর করে এই নামে ডাকে।

তারপর ঝিলমিল সকলের সঙ্গে খেলাঘরে এসে বসলো। সকলে তাকে ঘিরে বসে প্রশ্নর পর প্রশ্ন করে চললো। ঝিলমিল বল্লে : রোজ রাত্তিরে চাঁদের আলো হলে আমরা সব মাঠে এসে খেলা করি, অন্ধকার রাত্তিরে আসিনা। আজ আমি একাই এসেছিলাম কিন্তু

খানিক পরে দেখি আমার গলার হার নেই—যে সব গাছের নীচে ঘুরে বেড়িয়েছি সেগুলো সব দেখলাম কিন্তু কোথাও পেলাম না। গলার হার না হলে কালকে বন্ধুর জন্মদিনে নাচতে পাবো না যে। খরগোস বল্লে: তা এই নাওনা আমার গলার রঙ্গিন এই রিবণটা এটা চলবে না ?

—না ভাই ও রংএর সঙ্গে আমার ফ্রকের রং এক হবে না। নাচের পোষাক ম্যাচ করে পরতে হয় যে—ঝিলমিল বল্লে।

—তাহলে আমার এই গলার মালা—এগিয়ে এসে ডলি বল্লে।

—ধন্যবাদ ডলি একটাও হবে না ভাই, এই দেখ আমার ফ্রকের রং। আমি পোষাক পরে, মালা পরে নাচ প্র্যাকটিস করছিলাম, কালকে আমাকে নাচবার নিমন্ত্রণই করেছে যে।

—ওঃ তাহলে কি করা যায় ? ভালুক মেসো জোরে বলে উঠলো।

কাক্রি এবার বল্লে: আমি বলতে পারি—যদি তোমরা আমায় না বকো।

—না, না, বকবো কেন ? এত মুস্কিলে পড়েছে ঝিলমিল, কি বুদ্ধি তোমার আছে বল ?

কাক্রি বল্লে: তাহলে ঐ পুঁতির বাক্সটা আবার নামাতে হল—ওর মধ্যে অনেক রংএর পুঁতি আছে, যদি ওর ফ্রকের রংএ মেলে এখনি সকলে মিলে একটা হার তৈরী করে দেওয়া যায়।

—ঠিক, ঠিক, ঠিক বলেছে কাক্রি—সকলে সমবেত কণ্ঠে বলে উঠলো।

আবার পুঁতির বাক্স নামানো হলো। দেখা গেল ঝিলমিলএর যা দরকার সেই রং এর পুঁতি অনেক রয়েছে। তারপর গিন্নী পুতুল, খরগোস, কাক্রি আর হাঁসগিন্নী সবাই মিলে তখনি একটা সুন্দর নেকলেস তৈরী করে ফেললে।

ঝিলমিলও খুব খুসী—যদিও তার নিজস্ব সুন্দর হারটি হারিয়ে গেছে তার জন্যে খুব দুঃখ হচ্ছিল, কিন্তু কালকে সে যে নাচতে পারবে

এই মনে করে খুব খুসী হয়ে উঠেছে—কুচ্ছিত কাক্রি পুতুলটার সঙ্গেই ভাব জমিয়ে ফেললে।

তার সঙ্গে গল্প করতে করতে কাক্রি পুঁতির বাক্স নিয়ে যে ঘটনাটা একটু আগে ঘটেছিল তা বলে ফেললে। ঝিলমিল সহানুভূতি করে বল্লে: আহা হা ভাই তুমি এত বকুনী খেয়েছো? দেখ, তুমি যদি না বাক্স পাড়তে তাহলে পুঁতির কথা কেউ জানতোও না আর আমার কি অবস্থাটা হতো ভাব দেখি।

—কিন্তু আমি যা গালাগালি খেয়েছি। কাক্রির চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল গড়িয়ে পড়লো।

ঝিলমিল বল্লে: কেঁদনা ভাই তুমি, চল তোমায় কাল আমার নাচ দেখাবো, যাবে?

কাক্রি বল্লে: তা যেতে পারি কিন্তু—

—কিন্তু আবার কি? দেশ বেড়াতে ইচ্ছে করে না?

—নিশ্চয়ই।

ঝিলমিল বল্লে: দেখ ভাই কাক্রি, শিউলির বাক্স থেকে এতগুলো পুঁতি নিলাম ওকে একটা ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। তুমি একটা কলম দাও, আমি এই আমার ঠিকানা লেখা কাগজ আছে লিখে রেখে যাবো। এই বলে পকেট থেকে কাগজ বার করলো। কাক্রি তখন ভালুক মেসোর কাছে ছুটলো। হিসেব পত্তর তো সেই রাখে কাজেই তার কাছে পাবে কলম।

চালবাজ সুন্দর ডলি, চকচকে চোখ খরগোস, সাদা রং হলদে ঠোঁট হাঁসগিন্নী, ভালুক মেসো, হাতী—গিন্নী পুতুল কাউকে ঝিলমিল ভালবাসলো না ঐ কুচ্ছিত কাক্রিটাকে তার ভালো লাগলো? আশ্চর্য্য হয়ে সবাই ভাবতে লাগলো—যখন ঝিলমিল তার চমৎকার পাখা দু'টি ছড়িয়ে—যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল।

অন্ধকসকালে ঘুম ভেঙ্গে শিউলি তার ছোট ভাই শোভনকে নিয়ে খেলা-
গিয়ে বল্লে: জানিস শোভন, কাল একটা বিচ্ছিরী স্বপ্ন দেখেছি।

—কি রে দিদি কি ? শোভন বল্লে।

আমার পুঁতির বাক্সটা খোল তো দেখি। অনেক দিন খেলাঘরে আসিনি, কি যে সব হচ্ছে, পুতুলগুলো সব ঠিক আছে কিনা দেখতে হবে।

শোভন বাক্সটা নিয়ে এলো। শিউলি বাক্সটা খুলে দেখলো প্রায় সবই তার ঠিক আছে কেবল একটা বড় লাল পুঁতি আর আকাশ রংএর বেশ কতকগুলো পুঁতি নেই। আর একটা কাগজ পেলো—ঠিকানাটা পড়া গেল না। তাতে লেখা আছে—

বন্ধু শিউলি।

অনেক ধন্যবাদ তোমায়। তোমার জন্য আমি কাল বন্ধুর জন্মদিনে নাচতে পেলাম, নাহলে হার হারানোর জন্য মার কাছে বকুনী খেতে হতো, নেমন্তন খাওয়াও হতোনা। তোমাকে তাই ধন্যবাদ আর ভালবাসা জানাচ্ছি।

ঝিলমিল।

চিঠিটা পড়ে কিছু বুঝতে না পেরে শিউলি সেটা শোভনের হাতে দিল। তারপর সমস্ত খেলাঘর ভালো করে দেখলো—নাঃ সবই ঠিক আছে কিন্তু সেই কালো কুচ্ছিত কাফ্রি পুতুলটা কোথায় গেল ? কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না তাকে আর।

তুমি কি ধারণা করতে পারো মিনির খেলনার ঘরটা ? না কখনই না। কেন ? কেন তা বলছি শোনো, সেটা হলো একটা বড় পুতুলের দোকান—তা তুমি অনায়াসে বলতে পারো। এমন পুতুল বাজারে নেই যা না আছে মিনির খেলাঘরে। আমি ভাই অত নাম জানি না তাদের। রোজই নতুন রকমের পুতুল আসে।

কিন্তু হলে কি হয় এমন মেয়ে আমি দেখিনি. কেবলই অপছন্দ আর ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলা। যত রকমের খেলনা আছে তা পেয়েও ওর কি যে হয় মনে, হয়তো অনেক আছে বলে নাকি তা জানি না।

মা কেবল গুছিয়ে সাজিয়ে রাখেন। মিনির ঝি ঝাড়ামোছা করে আর মনে মনে গজরায়—"বাবাঃ এমন মেয়েও দেখিনি লোকে পায় না আর এ মেয়ে এত দামী দামী পুতুল পেয়ে তাদের এমনি করে নষ্ট করে, আর মা-বাপেরও বকুনী নেই"।

সত্যি পুতুলগুলো ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, রোগা হয়ে গেছে, কারো বা হাত পা নড়বড় করছে। মা অবশ্য বলেন—জলে ডুবিয়ে, মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে ওদের এ অবস্থা। কিন্তু আমি জানি অযত্নে আর ভয়ে ওদের এই রকম হয়েছে। মিনি খেলাঘরে ঢুকলেই ওরা ভয়ে আঁতকে ওঠে। মিনি যদি ইচ্ছে করতো সে আওয়াজ শুনতে পেতো। কিন্তু তার দেহ মনে যদি একটু মায়া দয়া থাকতো তবেই তো শুনবে না হলে আর শুনবে কোথা থেকে। তাই ওরা যখন সর্বদা নিজেদের অসহায় অবস্থার কথা গল্প করেনিজেদেরইকান্না পায়।

এমনি করে দিন কাটছিল—এমন সময় একটা চমৎকার পরী পুতুল খেলাঘরে এলো। যে রকম সুন্দর দেখতে, তেমনি তার পোষাক তেমনি তার গয়না আর মাথায় নতুন ফ্যাসানের একটা মুকুট। সব মিলিয়ে কি যে ভালো দেখতে সে—যে চোখ ফেরানো যায় না। পুতুলরা তাকে দেখে খুসী হলো কিন্তু ওর কথা ভেবে ওর জন্যে ওদের ভারী দুঃখ হলো। বেচারী কেন যে এসেছে এই খেলাঘরে।

নাক ভোঁতা পুতুল বল্লে: নতুন এসেছ ভাই এসো কিন্তু কি যে বলবো। ল্যাজ ভাঙ্গা প্লাষ্টিকের ইঁদুর বল্লে: কোথা থেকে এলে কে আনলো? পরী ছোট ছোট দাঁত বার করে হেসে বল্লে: মিনির মাসীর সঙ্গে এসেছি, কার জন্যে নিয়ে যাচ্ছিল জানি না। মিনি বল্লে: এটা আমায় দাও মাসী—তাই রেখে গেল। তোমাদের কথা শুনে আমার কিন্তু ভয় করছে।

ভালুকের গায়ের রেশমী কাপড়টা ছিঁড়ে ফেলেছে একটু মিনি। সে তার ক্ষতস্থানের দিকে তাকিয়ে বল্লে: ভয় পেয়ে আর কি হবে আমাদের সকলের অবস্থাই তো দেখতে পাচ্ছ।

—হ্যাঁ.সেই জন্যেই ভাবছি আমার এ অবস্থা হতে আর কত দেরী? ঐ যে রেগে গর গর করে জোরে পা চালিয়ে আসছে ঐ তোমাদের মিনি নাকি? পরী বল্লে।

ওর কথা শেষ হলো না, মিনি খেলাঘরে ঢুকেই সামনে যে খেলনাগুলো পেলো সেগুলো ছুঁড়তে আরম্ভ করলো। শব্দ পেয়ে পাশের ঘর থেকে মা এসে বল্লেন: এ সব কি হচ্ছে? ওদের হাড়গোড় আস্ত রাখবি না।

মিনির ছোট বোন বুলা বললো: রাগ হয়েছে যে, আজ যে পড়া পারেনি বলে খুব বকুনী হয়েছে, আর এই খেলনা ভাঙ্গার জন্যেও বকুনী শুনতে হয়েছে। মাষ্টারমশাই বলেছেন কি জানো? আর যদি কোনো দিন এ রকম করো তাহলে ভয়ানক শাস্তি দেবো।

বুলা কি বলছে কে শোনে—মিনি একটা করে পুতুল নিচ্ছে খেলনা নিচ্ছে আর রেগে ফেটে পড়ে সেগুলো ছুঁড়ছে। ধুপ দমাস। ঠং। ঝনাৎ—কত রকমের শব্দ যে হচ্ছে—তার ঠিক নেই।

—এ সব কি হচ্ছে মিনি কি ভেবেছ? দামী দামী পুতুল খেলনাগুলোকে কি ইঁট পাটকেল ভেবেছ? শীগগীর থামাও বলছি।

মা যে একেবারে ঘরের মধ্যিখানে এসে এমন করে বলবেন তা সে একবারও ভাবেনি। তাই একটু থতমত খেয়ে হাতটা থামালো।

মা পুতুলগুলো তুলতে তুলতে বল্লেন: এগুলোর আর কিছু আছে কি সব গেছে, এমন বদমেজাজী মেয়েও দেখিনি। যাও তুমি এ সব আমি বুলাকে দিয়ে দেবো।

মিনির যেন 'ডোণ্টকেয়ার' ভাব, গট মট করে চলে গেল। মা সবগুলোকে গুছিয়ে রেখে বকতে বকতে কাজে চলে গেলেন।

রাত্রি বেশ গভীর হয়ে এলো। মিনি তখন তার বিছানায় অসাড়ে ঘুমোচ্ছে। বাড়ীর সবাই ঘুমোচ্ছে, বাঘা কুকুর আর মেনী বেড়াল পর্য্যন্ত।

খেলাঘরে বসেছিল এতক্ষণ নতুন পরী পুতুল। ফিসফিসিয়ে অন্য খেলনাদের ডাক দিল—বল্লে: দেখ ভাই,—আমি এখানে থাকবো না ঠিক করেছি, বাবাঃ এ কি সাংঘাতিক মেয়ে, এর কাছে থাকা

চলবে না। আমি এ রকম কোথাও দেখিনি—তাই এ খেলাঘরে থাকছি না, তোমরা কেউ যাবে আমার সঙ্গে ?

কান্না ভেজা গলায় প্রায় সকলেই বলে উঠলো : আমরা আমরা যাবো তোমার সঙ্গে—আর আহত দেহ নিয়ে প্রায় সকলেই উঠে দাঁড়ালো।

—না দাঁড়াও, যাবো বল্লেই যাওয়া হয় না—কত দিন আছ এই খেলাঘরে। ভালুক গম্ভীর গলায় বল্লে।

জোরে কেঁদে উঠলো হাত-ভাঙ্গা পুতুল—বল্লে আছি অনেক দিন কিন্তু অত্যাচার সহ্য করার একটা সীমা আছে তো।

—হ্যাঁ তাই বলছি, মিনির এই অত্যাচার আর বদ-স্বভাব চালাকী করে দূর করতে হবে। আমরা সকলে দু'চারদিন অন্য কোথাও চলে যাবো—অনেক খুঁজেও যখন পাবে না তখন বুঝতে পারবে আমাদের মত বন্ধু সত্যিই ওর নেই।

খরগোস চোখ দু'টো বড় করলো, তারপর বল্লে : ওর ভারী বয়ে গেল, নতুন পুতুল আনবে। আমরা তো বিচ্ছিরি হয়ে গেছি।

ডলি বল্লে : তাও কি হয়—আমাদের পরিবারটা কম নয়, এত লোক চলে গেলে ওর মনে কিছুই হবে না বল কি ? কালো কুচ্ছিত কাফ্রি পুতুল নিজের গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে বল্লে: যা নিষ্ঠুর মেয়ে মিনি, দয়া মায়া আছে বলে মনে হয় না।

ভালুক বল্লে : থাক আর না থাক—আমি যা বলছি শোনো, আমার অনেক বয়স হয়েছে কাজেই বুদ্ধি নিলে ভালই হবে।

পরী পুতুল বলছিল তখন : কি জানি বাবা, এমন মার-খোর ওয়া আমার অভ্যাস নেই, তাছাড়া সাজ-পোষাক—

—আরে থামো তো বাচ্চা মেয়ে যা বলি শোনো,:যা বুদ্ধি বার ভালুকদাদা সেই মত চললেই ঠিক হবে। হাতী মোটা গলায় ঠলো।

রপর সারা রাত্তির ধরে কি পরামর্শ হলো তাদের মধ্যে আমরা

তা জানি না। সেই মিটিং-এ ভুলোও এলো মেনীও এলো—বেশ জোরালো বৈঠক হলো।

দু'দিন পরে বাড়ীতে মিস্ত্রি লাগবে বলে মা ঝি চাকর সবাইকে বলে দিলেন জিনিসপত্র সরাতে। খুব সাবধানে সরাতে হবে যেন একটি জিনিসও না ভাঙ্গে। মা মনে মনে ঠিক করলেন পুতুলের ঘরটা নিজেই পরিষ্কার করবেন। কি জানি যা ঝি চাকর, ভেঙ্গে চুরে তছনছ হবে।

এদিকে ভুলো আর মেনী দিনের বেলা যখন সব বিশ্রাম করতে ঘরে খিল দেয় তারা পুতুলগুলো একটা করে মুখে করে ষ্টোর রুমে যে প্রকাণ্ড পেষ্ট বোর্ডের বাক্সটা ছিল, যেটা করে একবার একগ্রোস কাঁচের বাসন এসেছিল—বাসন ব্যবহার হয়ে ভেঙ্গে গেলেও মা সেটা যত্ন করে রেখে দিয়েছিলেন। ভুলো আর মেনী দিনরাত মুখে করে বয়ে বয়ে সবগুলোকে তার মধ্যে পুরে রাখলো। তারপর চার-পাঁচখানা খবরের কাগজ নিয়ে তার মুখে চাপা দিল।

বেশ কয়েকদিন ধরে বাড়ী চুণকাম হলো। জিনিসপত্র ওলোট-পালোট হয়ে অসুবিধেতে ক'দিন কাটলো। মা ভাবলেন ঝি মানদা পুতুলগুলো ভালো জায়গায় রেখেছে। মানদা ভাবলো গিন্নীমা নজে হাত দিয়েছেন সেই ভালো—কারণ একটু ঠুক করলেই যা ভেঙ্গে যায় সে সব জিনিসে নিজেই হাত দিক বাবা, কি দরকার গুণগার দিয়ে।

তারপর ঘর বাড়ী পরিষ্কার হয়ে গেল, সব জিনিস ঠিক ঠিক জায়গায় গুছিয়ে রাখা হয়ে গেল। সব মিলিয়ে বেশ কয়েক দিন গেল। মিনি একদিন বল্লেঃ আমার খেলাঘরের জিনিসগুলো কোথায় গেল ?

মা বল্লেন : তবু যাহোক মনে পড়েছে, অনেক দিন ভাঙনি বলে বুঝি হাত নিসপিস করছে ?

মিনি বল্লে—কোথায় গেল সব ? পূজোর ছুটি আসছে আমি সব গোছাব এবার।

মা বল্লেন : তবু ভালো। ওরে মানদা ! কোন ঘরে দিদিমণির পুতুল খেলনা তুলেছিলি আজ দুপুরে সব গুছিয়ে দিস, মেয়ের হুঁস হয়েছে।

—আমি তো তুলিনি মা, তুমি তো কাঁচের জিনিসে হাত দিতে বারণ করো, দিদিমণির খেলাঘরে কাঁচের খেলনা তো বেশি। মানদা উত্তর দিল।

—সে কি ? আমি তো খালিই দেখছি, দেখ তাহলে গোবর্দ্ধনকে, হরিকে জিজ্ঞেস কর।

খানিক পরে মানদা আবার নীচে থেকে চেঁচিয়ে বল্লে : ওমা, ওরা বল্লে ওরা ওঘরে যায়নি। খেলনা তোলেনি ওরা বড় বড় জিনিসই সরিয়েছে নাড়িয়েছে।

—সে কি কথা, অতগুলো দামী দামী খেলনা সব গেল কোথায় ? মিস্ত্রিগুলোর কাজ নাকি ? অতগুলো নেবে কি করে ? না এক এক দিন করে সরিয়েছে ? এ কি কাণ্ড রে বাবা।

সেদিন সারা দুপুর খোঁজাখুঁজি হলো কিন্তু খেলনা পুতুলের সন্ধান পাওয়া গেল না ! ষ্টোর রুমেও যাওয়া হয়েছিল, কিন্তু ঐ একপাশে রাখা প্রকাণ্ড বাক্সটাকে কেউ হাত দেয়নি আর ভাবেও নি।

মা তো রোজই আপশোষ করতে থাকেন। মিনিকে বলেন : যেমন সব ভাঙতে, অযত্ন করতে তেমনি বেশ শাস্তি হয়েছে। কোনো জিনিসেরই অযত্ন অবহেলা করতে নেই। পুতুলগুলোর কি অবস্থা হয়েছিল তোমার হাতে পড়ে ভাবো তো একবার।

মা তো উঠতে বসতে বকছেন। বাবা যে কখনও কিছু বলেন না সেদিন তিনিও বল্লেন : নিজের জিনিসপত্র নিজে দেখলে না [illegible] মা. অতগুলো জিনিস সব গেল।

[illegible] অনুশোচনায় অস্থির হয়ে যাচ্ছে। খেলনাগুলো যদি [illegible] ওয়া যেতো কিছুতেই আর সে অমন করতো না।

একদিন রাত্রে মিনি স্বপ্ন দেখলো কোথায় যেন বেড়াতে গেছে। খোলা জায়গা তার কাছে কুয়োর মত একটা জিনিস। তার পুতুলগুলো যেন তার ভেতর থেকে মুখ বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলছে, কি গো মিনি, আমাদের ভুলে গেলে ?' কথা বলা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা আবার ডুব দিচ্ছে।

ঘুম ভেঙ্গে সারা সকাল মিনির মন খারাপে কেটেছে। সেদিন রবিবার তাই স্কুল যাবার তাড়া নেই। মিনি ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাবা ডেকে বল্লেন : মিনি, মাকে বলগে তো, আমার অফিস ঘরের কিছু জিনিসপত্র অন্য জায়গায় পাঠাতে হবে একটা বড় সুটকেশ কিম্বা কাগজের বাক্স কিছু দিতে পারেন কিনা—তার মধ্যে ভরে পাঠিয়ে দেবো।

মা ষ্টোর রুমে কি যেন করছিলেন—মিনি গিয়ে তাঁকে বলতেই তিনি বল্লেন : যা দেবো তা তো আর ফিরে আসবে না। উনি যতই বলুন আমি জানি সেবারও একটা সুটকেশ নিয়েছিলেন আর আনেন নি। তার চেয়ে ঐ কাগজের বাক্সটা আছে ঐটা দেবো—হরি—একবার ওপরে আয় !

মিনি ততক্ষণে বাক্সটার কাছে গেছে, কাগজগুলো ফেলে দিয়ে উপরের ডালাটা খুলবার আগে ভাবতে লাগলো : এমন হয় না, এর ভেতর হাত ঢোকালেই আমার পুতুলগুলো পেয়ে যাই ? যদি পাই আর কোনোদিন তাদের কষ্ট দেবো না। নিজের মনে ভেবে মিনি আবার বলে উঠলো : এসব ভাবনা তো আর সত্যি হয় না ! আচ্ছা দেখি বাক্সটা, যদি কিছু থাকে বার করে খালি করে দিই, হরি আসছে নিয়ে যাবে।

মিনি হাত ঢুকিয়ে দেখলো হাতে যেন কি ঠেকছে, ভাবলো : মা ভুলেই গেছে এর মধ্যে জিনিস রেখেছে, আমিই খালি করে দিই—মিনি যতই একটা করে তুলতে থাকে, ততই অবাক হয়ে যায় ! এ কি ? এ কেমন করে সম্ভব ? সে ঘুমিয়ে আছে, না জেগে আছে, স্বপ্ন দেখছে না সত্যি ঘটছে ?

মা, বাবা হরি সবাই এসে দেখলেন —একরাশ পুতুল খেলনার মধ্যে মিনি বসে আছে।

তারপর কি হলো বুঝতেই পারছো ?

সেদিন রাত্রে মিনির খেলাঘরে—জলসা আর ভোজের ব্যবস্থা !

হাত ভাঙ্গা কাঁচের পুতুল দিব্যি ঘুমুর পরে নাচতে সুরু করেছে, ভালুকদাদার গলা দিয়ে দিব্যি গানের সুর বেরুচ্ছে, খরগোস ফুল নিয়ে টেবিল সাজাতে আরম্ভ করেছে। নাক থ্যাবড়া মোটা গিন্নী পুতুল রান্নার কাজে ভারী ব্যস্ত হয়েছে। আর কাফ্রি পুতুল পরীর কাছে গিয়ে বলছে : দেখছো তো ভালুকদাদার বুদ্ধি। তুমি হট হট করে চলে যেতে চাইছিলে। দেখেছ তো কি সুন্দর কাঁচের আলমারী তৈরী হচ্ছে আমাদের জন্যে এবার আমরা কত আরামে থাকবো, গায়ে একটুও ধূলো লাগবে না। পরী পুতুল সত্যি অবাক হয়ে গেছে।

মস্ত বড় আলমারীতে মিনির খেলাঘর উঠে এসেছে, ঐ দেখ এখন মিনি মাঝে মাঝে এসে ঝাড়ামোছা করে যায়। কিন্তু মোটা হলেও ভালুক দাদার বুদ্ধি আছে কি বল ? আর আজকের ভোজ ভুলো আর মেনীকে নিয়েই—তাদের জন্যেই !

পুতুলের ঘরেই লাল নীল মাছের কাঁচের বড় জারটা ছিল। যখন রুবির সখ ছিল তখন অনেকগুলো মাছও ছিল আর পুতুলের ঘরেই রাখা হয়েছিল। দিনের বেশ কিছু সময় রুবি থাকতো ওর খেলাঘরে তাই মাছগুলোও নজরে থাকতো—জল বদলানো হতো, খাবার পেতো। রুবির স্কুলের কাজও বেড়েছে, উঁচু ক্লাসে উঠেছে পুতুল খেলনার দিকে অত আর মন নেই তাই অযত্নে ধূলো পড়েছে তাঁদের গায়ে। আর মাছেদের অবস্থা খুবই খারাপ। হরি চাকরের যদি ইচ্ছে হলো বা মনে পড়লো তবেই জল বদলানো হলো না হলে যেমন আছে তেমনিই চলতে লাগলো।

পুতুলদের সঙ্গে মাছেদের খুব ভাব। সন্ধ্যা একবার হলেই হলো। তারা সবাই এসে কাঁচের জারের চারদিকে গোল হয়ে ঘিরে বসে গল্প করতো। খরগোস প্রায়ই বলতো রাঙা দাদা, তুমি যে এত

জলে থাক, তোমার একটুও সর্দি হয় না, জ্বর হয় না শরীর খারাপ হয় না ?

নীল মাছ হেসে বলতো না হয় না, কিন্তু যদি ডাঙ্গায় যাই একটুও বাঁচবো না বুঝলে ?

চোখ কপালে তুলে মুড়কি পুতুল বলে : ওমা কি যে বলে, অতক্ষণ জলে থাকলে মায়ের কাছে তো মার খেতেই হতো আর নিউমোনিয়া ধরে যেতো।

তুলোর সাদা হাঁসটা বল্লে : আমরাও জলে থাকি তবে ভাই তোমার মত নয়। তুমি তো রোজই আমায় ডাকো কিন্তু আমি একটু আধটু জানতে পারি তোমার মতো সারা জারের জল তোলপাড় করে বেড়ানো, আমি ভাই তা পারিনে। আমি জলের ওপর সাঁতার কেটে বেড়াতে পারি এই পর্যন্ত।

—কেন এসোনা, একটু ডুব ডুবুরী খেলি জলের মধ্যে ? নীলমাছ তার সোনালী পাখার ঝাপটা দিয়ে ভুস করে জলের মধ্যে ডুবলো আবর তর তর করে ওপর দিকে উঠে এসে মুখ তুলে আবার বল্লে : এস হাঁস দাদা, এসো।

—না ভাই, দস্যিপনা আমার দ্বারা হবে না, অমি একটু মিষ্টিগান গেয়ে জলের উপর ভেসে বা সাঁতরে বেড়াতে পারি—ওসব পারবো না।

খরখরে কাঠের পুতুলটা, তখনি বলে উঠলো : কি করে আর পারবে দাদু ডুবে মরতে হবে যে, একে পেট ভারী তার উপর সাঁতার ছাড়া আর কিছুই শক্তি নেই।

কাঠের পুতুলের কথা শুনে মুচকি হাসলো আর রেগে গিয়ে হাঁস বল্লে : আমি তো পারি না, তুই দেখানা কেমন ক্ষমতা। কাঠের পুতুল খটখটিয়ে একেবারে সামনে এসে দাঁড়ালো বল্লে : কি যে বল দাদু, তা কি হয়। আমার গায়ে এত রং করে চিত্র বিচিত্র কাটা। জল লাগলে তার কিছু থাকবে নাকি, তার চেয়ে বল ঐ খেলাঘরের দোতলা সখানায় উঠে সারা খেলাঘরের সহর ঘুরে আসছি।

সকলে হো হো করে হেসে উঠলো। কাঠের পুতুল ততক্ষণ দোতলা বাসে কন্‌ডাকটরকে বলছে : একটা দু'আনার টিকিট, লেকের কাছে নামিয়ে দেবে। জলে নামবো না, হাওয়া খাবো।

কন্‌ডাকটার টিকিট দিল বল্লে : আচ্ছা লেকের কাছে নামিয়ে দেবো।

এদিকে নীলমাছ তার পাখা মেলে দেখতে লাগলো আর যে যার কাজে চলে গেল।

রুবিদের পুষিটার কিন্তু খেলাঘরে খুব যাতায়াত ছিল আর পুতুলদের কাছে চোখ বুঁজে বসে থাকতো—এক একবার চোখ ফাঁক করে কাঁচের জারের দিকে তাকিয়ে ঢোঁক গিলতো। মনে ভাবতো অতগুলোর একটা খেতে পেলুম না, আবশিষ্ট একটা, এটা বেঁচে থাকতে থাকতে কেমন করে ঘায়েল করি ভেবে পাচ্ছি না। প্রতিদিনই পুষি চেষ্টা করে কিন্তু বিফল হয়। আজ যখন সকলে তার কাছ থেকে সরে গেল ; বজ্জাত কাঠের পুতুলটাও লেকের হাওয়া খেতে গেল তখন তার মনে হলো বেশ খানিকটা সুযোগ। তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলো কুচ্ছিত কাফ্রি পুতুলটা আছে কিনা। না, সেও আজ ভাল্লুক দাদার সঙ্গে বাজারের বাস্কেট হাতে করে গেছে আজ ডলির জন্মদিন, ওদের ভোজ। কিন্তু ওদের ভোজের জিনিস খেতে একটুও ভালো লাগে না আজ যদি নীলমাছটাকে কোনরকমে কায়দা করতে পারি তাহলে আজ আমারও বেশ ভোজটা হবে'—মনে মনে ভাবলো পুষি আর ঢোক গিলে কাঁচের জারের দিকে এগিয়ে গেলো।

কিছুক্ষণ পরে বিরাট শব্দ শুনে পুতুলেরা সবাই ছুটে এলো আরে এ কি কাণ্ড—চীৎকার করে উঠলো সব কোরাসে। কাঁচের জার ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে মেঝেতে ছড়িয়ে পড়েছে, একটু দূরে মাটির ওপর নীলমাছটা খাবি খাচ্ছে আর পুষি লেজ তুলে দৌড়ে পালাচ্ছে।

কাফ্রি পুতুল বাজারের বাস্কেটটা নামিয়ে বল্লে : ও, তাই রোজ ধ্যানী বুদ্ধের মত চোখ বুঁজে বসে থাকা হয়। মনের মতলব অন্য

রকম। দাঁড়াও হতচ্ছাড়া বেড়াল, তোমাকে আমি কেমন জব্দ করি।

আরে ও কাফ্রি দাদা, এসো এসো হেলপ করো খরগোস বলে উঠলো।

রুবি ইংরাজি স্কুলে পড়ে, চটপট ইংরাজি বলে, খেলাঘরে এসেও একই কথা—কাজেই সকলেই দু'চারটে ইংরাজি কথা শিখে গেছে।

খরগোস, কাফ্রি, জন্মদিনের সাজপরা ডলি, ভালুক, বৌপুতুল, হাতী, ইঁদুর, হাঁস, মুড়কী পুতুলটা পর্যন্ত দৌড়ে এলো কিন্তু সকলে মিলে ধরে নীলমাছকে তুললে বটে, কিন্তু রাখতে গিয়ে দেখে ওমা! জারটা ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেছে। নীলমাছের চোখ স্থির হয়ে এসেছে, এখনি প্রাণটা বেরিয়ে যাবে। এমন সময় বাস থামিয়ে কাঠের পুতুল খটখট করে এসে উপস্থিত—কি হয়েছে? হয়েছে কি?

সব শুনে সে বল্লেঃ এখনি ব্যবস্থা করছি দাঁড়াও—বলে তড়াক করে লাফ দিয়ে টেবিলের ওপর মস্ত যে ফ্লাওয়ার ভাস ছিল তার ভেতর জলে দু'চারটে লাল টুকটুকে গোলাপ উঁকি দিচ্ছিল—তাদের এক পাশে ঠেলে দিয়ে বেশি জায়গা করে, টেবিলের ধারের দিকে ঠেলে নিয়ে এসে বল্লেঃ দাও কাফ্রি দাদা, এই জলটায় নীল-মাছকে ছেড়ে দাও।

সকলে মিলে ধরাধরি করে তাকে জলটায় ছাড়লে বটে কিন্তু সে যেন কেমন নিস্তব্ধ, নিথর হয়ে পড়ে রইল, ঠিক বেঁচে আছে কিনা বোঝা গেল না।

ভালুক বল্লেঃ খানিকটা জলে থাকুক—বড্ড কষ্ট পেয়েছে, এতক্ষণ শুকনো মাটিতে পড়েছিল। সরে আয় সব।

সরে আসতেই হলো, কারণ মনে হলো দরজা খুলে কে যেন খেলাঘরে ঢুকছে, রুবি কি তার মা কি চাকর কেউ হবে—তাই সবাই যে যার জায়গায় গিয়ে স্থির হয়ে বসে পড়লো।

দরজা ঠেলে ঢুকলো রুবি আর তার মা। মা খুব বকছেন রুবিকে : আজ রবিবার, স্কুল নেই তবু একবার এ ঘরে সব গুছিয়ে গাছিয়ে রাখতে পারো না, এত বড় মেয়ে হয়েছ! পুতুলগুলোর কি ছিরি হয়েছে, টেবিলের ফুল কতদিন বদলানো হয়নি—কি যে কর। রুবি বল্লে : দেখ মা দেখ, কাঁচের জারটা এমন হলো কি করে? মাছটা গেল কোথায়।

মা মেয়ে হুমড়ি খেয়ে দেখতে লাগলো—টুকরো টুকরো হয়ে ভাঙ্গা কাঁচের মধ্যে যদি নীলমাছটা থাকে। কিন্তু কই না, নেই। মা হঠাৎ জোরে বলে উঠলেন : এই যে রে রুবি ফ্লাওয়ার ভাসের মধ্যে রয়েছে মাছটা, শীগগীর হরিকে বল আর একটা জারে জল আনতে।

জলও এলো মাছটাকেও তোলা হলো কিন্তু সে বেঁচে আছে বলে মনে হলো না। মা তখন ঘর পরিষ্কার করতে ব্যস্ত। রুবি তাকিয়ে তাকিয়ে বহুক্ষণ পরে দেখলো ওর সোনালী পাখা দু'খানা যেন নড়ছে রুবি ভাবল তাহলে হয়তো বাঁচবে এবার নীলমাছটা।

সত্যিই বাঁচলো এ যাত্রা নীলমাছ। তার সব রকম ব্যবস্থা করে, ঘর পরিষ্কার করিয়ে, মা আর রুবি বাইরে আসবার সময় রুবি বল্লে : আচ্ছা মা ঘরে তো কেউ যায় না বিশেষ, জারটা কে ভাঙলো আর মাছটাকেই বা ওখানে তুলে দিল কে বলতো।

মা একটু ভাবলেন—বল্লেন : বুঝতে তো পাচ্ছিনা কিছু। হয়তো বা ঐ নতুন বাচ্ছা চাকর মংরু হবে। ভয়ে বলছে না, ওর তো সব জিনিসেই হাত দেওয়া আর নাড়াচাড়া করা অভ্যাস।

খেলাঘরে তখন হাসির ঢেউ উঠেছে। কাফ্রি বলছে আমার ইচ্ছে করছে রুবিকে বলে আসি তোমার পুষিটা কি শয়তান। হাঁস বল্লে : যাই হোক 'সব ভালো যার শেষ ভালো'—মাছও বেঁচেছে, ঘরও পরিষ্কার হয়েছে। আজ ডলির জন্মদিনটা খুব ভালো করে হবে।

নাক টেনে খরগোস বল্লে : রান্নার কি সুগন্ধ বেরিয়েছে, আমার তো এখনি ক্ষিদে পাচ্ছে।

কাঠের পুতুল খটমট করে বল্লেঃ হ্যাংলাপনা করিস নি, আজ জলসা হবে—শুধুই কি ডলির জন্মদিন, এতবড় একটা ফাঁড়া কাটলো নীলমাছের তার জন্যে একটা আনন্দোৎসব নেই। কিন্তু বলে দিচ্ছি সবাইকে, পুষিকে কেউ এঘরে ঢুকতে দেবে না।

বৌ পুতুল বল্লেঃ ঠিক বলেছিস 'মন্দ সঙ্গ সব সময় ত্যাগ করা উচিত'। কাফ্রি তাঁর লম্বা সোজা চুলগুলো একবার নামাবার বিফল চেষ্টা করে বল্লেঃ এই মিঞা থাকতে পুষি আর এ ঘরের ত্রিসীমানায় আসতে পারবে না দেখে নিও।

নীলমাছ সব শুনছিল, মনে মনে কাফ্রি পুতুলকে অনেক ধন্যবাদ দিল।

পাপড়ীর খেলনাগুলো যাহোক তাহোক কিন্তু মস্ত ডলি পুতুলটা খুব চমৎকার দেখতে। যেমন চুল সাজানো তেমনি পোষাক, তিন রং সিল্কের জামা টুপি—তাছাড়া জুতো মোজা—। একটু আলো আঁধারির মাঝখানে ওকে দাঁড় করিয়ে রাখো ঠিক মনে হবে একটা ছোট খুকু দাঁড়িয়ে আছে। পুতুলটার নাম হলো উর্মিমালা। নাম শুনলে তো দাঁড়িয়ে পড়তে হয়—কি শক্ত নাম—কিন্তু পাপড়ী বলে ও মার কাছে শুনেছে যে খুব ভাল দেখতে হয় তার নাম উর্মি রাখা যায়।

যাই হোক ঊর্মিমালা সকলের আদরে ভালই ছিল কিন্তু হলে কি হবে বড় অহঙ্কারী সে। নিজের যত্ন নিজের পোষাক পরিচ্ছদ এই নিয়ে সে ভারী ব্যস্ত আর—নিজে সুন্দর দেখতে বলে কারুর সঙ্গে মিশতো না—আর খেলাঘরের জন্য পুতুলরা যদি তার কাছ ঘেঁষে আসছে তাহলে আর রক্ষা নেই। অসভ্যের মত রেগে চেঁচিয়ে

একেবারে সবাইকে অস্থির করে তুলবে আর বেশি রেগে গেলে বলবে: 'আমি হলাম রাণী উর্মিমালা' তোমাদের ভয় করে না নিজেদের সঙ্গে সমান করে কথা বলো।

অন্য পুতুলরা অবাক হয়ে যায়—কিন্তু কালো কুচ্ছিত দুষ্টু কাফ্রি পুতুলটা তার গোল চোখ দু'টো বার করে বলে: আহা রাণী, নিজে নিজেই রাণী হয়ে বসছো, কিন্তু চেঁচালে আর রাগলে কি রাণী হওয়া যায়—তা হতে গেলে অনেক গুণ থাকা চাই।

উর্মিমালা আরো রেগে গিয়ে বলে: হতচ্ছাড়া কুচ্ছিত পুতুল, যেমন রূপ তেমনি গুণ, কথার ছিরি দেখ না। দেখতে পাচ্ছ না আমি কি রকম সুন্দর আর আমার পোষাক কি রকম দামী, তোমাদের মত আমি ওরকম থাকতে পারবো না—এই বলে গদীআঁটা চেয়ারটায় বসে পড়ে খরগোসকে বল্লে: এই ছোকরা আমায় চা দিতে বল্ তো!

খরগোসের লাল পুঁতির চোখ দু'টো একটু চিকচিক করে উঠলো তারপর দুষ্টু হাসি হেসে রান্নাঘরে গিয়ে বল্লে: উর্মিমালা মহারাণীর চা বানাও—তারপর গলার আওয়াজটা নীচু করে বল্ল: চিনির বদলে নুন দিয়ে দিও—বুঝলে? একটু জব্দ হোক—যেমন নিজেই রাণী সেজে বসে আছে—।

সেদিন উর্মিমালার চায়ে চিনি না নুন পড়েছিল সে খবর সঠিক বলতে না পারলেও ঝগড়াঝাঁটি-টা ক্রমশঃ যে বেড়েই চললো সে খবরটা আমরা পেয়েছি। শেষ পর্যন্ত সেদিন ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটলো। উর্মিমালার ঐরকম কথাবার্তা শুনে খেলাঘর থেকে হাতী আর ভালুক বেরিয়ে এসে ওকে বলে: দেখ উর্মিমালা এ রকম ঝগড়াটে আর অহঙ্কারী স্বভাব নিয়ে দিনরাত ঝগড়াঝাঁটি করে অশান্তি করা চলবে না! দেখতে ভাল তার পোষাক ভালো বলে রাণী হয়ে থাকতে চাও তা হয় না, রাণী হতে গেলে অনেক গুণ থাকা চাই, সকলকে ভালবাসতে শেখা চাই, সকলের সঙ্গে ভালো

ব্যবহার করা চাই—অনেক কিছু গুণ থাকলে তবে রাণী হওয়া যায় বুঝলে ?

ঊর্মিমালার রাগ আরো বেড়ে গেল—বলে কিনা গুণ থাকা চাই, আমি এত সুন্দর আমার কোনো গুণ নেই, রাণী হতে পারি না। ভালুক তখন বলছে: বড় অহঙ্কারী ঊর্মিমালা, ওরকম ভালো না। মিলে মিশে বন্ধুত্ব করে সবাই থাকবে তা না কেবল আমি সুন্দর আর পোষাক সুন্দর,আমি রাণী হয়ে থাকবো—এ কি মন, এসব তো ভালো না।

হাতী তার শুঁড়টা উঠিয়ে বল্লে: একজন এরকম হলে খেলাঘরের সকলেই বিগড়ে যাবে। ঊর্মিমালাকে ঠিক করতেই হবে।

কিন্তু কিছুই হলো না—সেদিন খেলাঘরে প্রলয়কাণ্ড ঘটে গেল আর রাগ করে ঊর্মিমালা খেলাঘর থেকে বেরিয়ে সোজা রাস্তা ধরে চললো। তখন রাত বেশ অনেকখানি।

ঊর্মিমালা এত রেগে গেছে কান লাল হ'য়ে গেছে আর মাথায় রক্ত উঠে গেছে। ভাবতে ভাবতে পথ চলছে: আমায় বলে অহঙ্কারী আবার আমার নাম ধরে ডাকে। আমি হলাম রাণী, তা সম্মান করে কথা বলো তা নয় আবার যা তা বলা। কে থাকবে ঐ খেলাঘরে? পাপড়ী তো আজকাল পড়াশুনোয় এত ব্যস্ত এদিকে দেখবার সময় নেই, যদি একবার আসবে অমনি ওর মা বলবে: দিন রাত খেলা ছাড়ো পাপড়ী, পরীক্ষা এসে গেছে····

তাহলে তাই হোক, পাপড়ী পরীক্ষা দিক আর ওরা ঝগড়া করুক—আমি এখানে আর থাকছি না।

ঊর্মিমালা ভাবছে আর পথ চলছে····অনেকক্ষণ পথ চলার পর যখন দেহ ক্লান্ত হয়ে এসেছে তখন সে দেখতে পেলো একটু দূরে একটা বাড়ীতে আলো দেখা যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে সে কাছাকাছি গিয়ে জানালা দিয়ে মুখ ঢুকিয়ে দেখলো এটাও একটা

খেলাঘরের বাড়ী—পুতুলদের দেশেও তো রাত্রে দিন হয়—তাই তাদের ঘর সংসার ও অন্য অন্য সব কাজ সুরু হয়ে গেছে।

জানালা দিয়ে উর্মিমালা বল্লে: দরজাটা খোলো আমি তোমাদের কাছে যাবো।

নতুন মুখ, নতুন গলার আওয়াজ তাই তারা সবাই মুখ তুলে তাকালো আর তার সুন্দর চেহারা আর সুন্দর পোষাক দেখে দরজা খুলে দিল।

উর্মিমালা ঘরে ঢুকেই কিছু না বলে চেয়ারে বসে আদেশের সুরে বল্লে: পাখাটা জোর করে দাও আর এক কাপ চা কিম্বা কফি দাও দেখি—অনেক পথ হেঁটেছি—এই বলে ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে রুমাল নিয়ে মুখ মুছতে লাগলো।

পুতুলরা সব অবাক! চেনা নেই পরিচয় নেই কোথা থেকে এসে আবার অর্ডার করা হচ্ছে—ভারী অসভ্য তো! কিন্তু এদের ভেতর থেকে ততক্ষণে একজন তাকে এক কাপ কফি এনে দিয়েছে আর পাখা জোরে চলেছে।

কফি শেষ করে উর্মিমালা বল্লে: তোমাদের এ বাড়ীতে আমার মত সুন্দর তো কেউ নেই দেখছি—তা হলে আমি এখানকার রাণী হই কি বল?

সকলে প্রথমে অবাক হলো ওর কথা শুনে তারপর সেপাই এগিয়ে এসে নমস্কার করে বল্লে: আপনি আমাদের বাড়ী এসেছেন সেজন্যে আমরা সুখী হচ্ছি—তবে আমাদের রাণী আছেন সেইজন্যে আমরা তো আর কাউকে রাণী করতে পারবো না।

উর্মিমালা রেগে চারদিক দেখে নিয়ে বল্লে: কোথায় সে?

ভালুক বল্লে: কার কথা বলছো, আমাদের রাণী? ঐ যে চেয়ারে বসে।

উর্মিমালা মুখ ঘুরিয়ে দেখলো একটু দূরে একটা চেয়ারে একজন পুতুল বসে। মাথায় ঘন কালো চুল আর মুখটা হাসি হাসি—দেখলেই

ভালবাসতে ইচ্ছে করে। চেয়ারে বসে একমনে উলের জামা বুনছে আর যে উলের বলটা পায়ের কাছে পড়ে আছে সেটাকে নিয়ে বাচ্চা কুকুরটা খেলা করছে।

মুখে একটা শব্দ করে ঊর্মিমালা বল্লে: ওঃ ঐ তোমদের রাণী? ওকে আমি জানি যেমন ছোট, তেমনি সাজ পোষাকের কিছু বোঝে না, জানেও না—দেখ ওর পোষাক আর আমার! গর্ব করে তাকালো নিজের চকচকে সিল্কের পোষাকের দিকে।

রাণী সব শুনছিল—একটু হেসে বল্লে:—আমার পোষাক যাই হোক—আমি এদের বন্ধু, ওরা অবশ্য আমায় রাণী বলে—আমি এদের খুব ভালবাসি।

—ভালবাসি বল্লেই তো হয় না, যোগ্যতা থাকা চাই বুঝলে? রাণীর মত চেহারা পোষাক পরিচ্ছদ সবই চাই—ঊর্মিমালা বল্লে।

ওর কথা বলার ভঙ্গী আর গলার আওয়াজ শুনে সব পুতুলরা দল বেঁধে এলো—ভাবখানা যদি আর দ্বিতীয় কথা বলো তা হলে আমরাও অপমান করবো তোমাকে।

রাণী বল্লে: তোমরা ভাই যাও নিজের কাজে আমি আমাদের অতিথি বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছি।

—কিন্তু রাণী—সকলে একসঙ্গে আপত্তি করে উঠলো—কবে হলো।

বাধা দিয়ে রাণী বলে: না না কেউ কিছু আমায় বলবে না তোমরা যাও।

ঊর্মিমালা তাদের বল্লে: আমি তো এখানকার রাণী হবো বলে এসেছি—অতিথি নয়—যাও তোমরা এখান থেকে।

পুতুলরা তাদের রাণীর কথায় চলে গেল—আর ঊর্মিমালা সোজা পালঙ্কের উপর গিয়ে শুয়ে পড়লো।

রাণী অল্প হাসছে আর সেলাই করছে।

ভালুকের সব চেয়ে ছোট বাচ্চাটা এসে খাটের কাছে গিয়ে বল্লে: নতুনদিদি দাও না ভাই আমার জামার বোতামটা লাগিয়ে—বলে পিঠ ফিরিয়ে দিয়ে দাঁড়ালো।

গর্জে উঠলো উর্মিমালা: কি, আমায় বলে কিনা জামার বোতাম লাগিয়ে দিতে, কি আস্পর্দ্ধা—রাণীর সঙ্গে কথা বলতে জানো না ক্ষুদে কোথাকার। বাচ্চাটা চমকে উঠে তাড়াতাড়ি সরে গেল আর রাণী তার হাতের বোনা থামিয়ে তাকে ডেকে জামার বোতাম লাগিয়ে দিয়ে গাল টিপে আদর করে বল্লে: যাও খেলা করগে।

কিছুক্ষণ পরে উর্মিমালা রাণীকে বল্লে: অত সুন্দর টুকটুকে উল দিয়ে কি বুনছো আর কার জন্যে বুনছো?

রাণী হেসে বল্লে: একটা কোট বুনছি—কাফ্রি পুতুলটার জন্যে, শীত এসে গেল কিনা।

আঁতকে উঠলো উর্মিমালা: বলে কি? ঐ কুচ্ছিতটার জন্যে এমন সুন্দর উলের জামা? নাঃ তোমরা যে কি তা আর কি বলবো।

রাণী বল্লে: কুচ্ছিত কিনা, জানি না, তার রংটা কালো। হলোই বা, রং নিয়ে কি বিচার হবে?

—তাই বলে রাণী বুনে দেবে তার জামা? উর্মিমালা বললে। রাণী হেসে বল্লে: আমার তো মনে হয়—রাণীরই করা উচিত। এদের সুখদুঃখ সব যদি না দেখবো তবে রাণী কিসের? রাণী তো শুধু বসে থাকার জন্যে নয়।

রেলগাড়ীটা হুইশেল দিয়ে এসে উপস্থিত হয়ে বল্লে: বেড়াতে যাবে রাণী—তাহলে ওঠো দরজা খুলে।

রাণী বল্লে: আমি কাজ সেরে নিই তুমি ঐ নতুন অতিথিকে নিয়ে বেড়িয়ে আনো।

ইঞ্জিন-এর বাঁশী বাজলো আবার—কিন্তু উর্মিমালা—নাক উঁচু করে বল্লে: ওর ভেতর গেলে যদি আমার পোষাক নষ্ট হয়?

রাণী উত্তর দেবার আগেই রেলগাড়ী মুখ ঘুরিয়ে বল্লে: তাহলে যেওনা।

রেলগাড়ী ঘ্যাস ঘ্যাস শব্দ করে চলতে লাগলো—ইঞ্জিনটা জোর দিয়ে হেসে উঠলো আর আস্তে আস্তে বল্লে: অসভ্য মেয়ে—যেমন কথাবার্তা তেমনি ব্যবহার—ভারী জামাকাপড়ের গর্ব করছে।

সাদা মোটা ইঁদুর রান্না চাপিয়েছিল—উর্মিমালা তার কাছে গেল, বল্লে: এই ছোকরা তাড়াতাড়ি রান্না কর, আমার খাবার সময় হয়ে গেছে। ইঁদুর একটু দুষ্টু ছিল, তাছাড়া উর্মিমালা এসে পর্যন্ত যা করছে তাতে ওর খুব রাগ হয়ে গেছে। ভাবছিল ভালমানুষ রাণীর কর্ম নয়, একবার আমার কাছে এলে হয়—মজাটা টের পাওয়াবো। তাই উর্মিমালা কাছে আসতেই আর আদেশ করতেই মুখ ঘুরিয়ে বল্লে: ক্ষিদে পেয়েছে তা আমি কি করবো?

—কার সঙ্গে কথা বলছিস? আমি হলাম রাণী। চেঁচিয়ে উঠলো উর্মি।

—কাদের রাণী তা জানি না, আমাদের রাণী ঐখানে বুনছে। তার কথা শুনে কান জুড়োয় আর তোমার কথা? আহা যেন গালে চড় মারছে। মিষ্টি কথা বলতে জানো না, আবার রাণী হতে চাও।

—একফোঁটা ইঁদুর—ভারী কথা শিখেছে দেখি—তেড়ে এলো উর্মিমালা। ইঁদুর রেগে বল্লে: তুমি এখান থেকে সরে যাও বলছি, আমি সবে ষ্টোভের উপর দুধ চড়িয়েছি—রান্নার এখন ঢের দেরী। যদি না যাও গরম দুধ গায়ে পড়লে আমি জানি না।

উর্মিমালা এবার এলো মিষ্টির দোকানের ছেলেটির কাছে—এই দে তো গোটাকতক সন্দেশ।

—না, তোমায় দেবো না, পয়সা দিলেও দেবো না—তোমার মত যার কথা আর ব্যবহার তার সঙ্গে আমরা মিশি না, কথা বলি না!

—কি দিবি না ? গর্জে উঠলো ঊর্মিমালা—পয়সা আবার কি ? এমনি দিবি, আমি রাণী তা জানিস ? এই বলেই এক চড় তার গালে। ছেলেটাও ছাড়বার পাত্র নয়—ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল ; সন্দেশের দোকানের জল ঠোঙ্গা সব এদিক ওদিক পড়ে ছিল সেগুলো পোষাকে লেগে দাগ হলো।

চেঁচামেচি গোলমাল শুনে সকলে ছুটে এলো। ঊর্মিমালাকে তুললো আর মুখ লুকিয়ে সব হাসাহাসি করতে লাগলো। ভালুকের বুদ্ধি মোটা তার চেহারার মত,—সে মুখের সামনেই বলে ফেললে : কি বেয়াক্কেলে মেয়ে বাবা তুমি, ঝগড়াটেও তো কম নও—এখান থেকে সরে পড় দেখি—আর কিছুক্ষণ থাকলে আমাদের ঘর সংসার তছনচ করবে। রাণী রাণী করে চেঁচাচ্ছ কেন ? রাণী কাকে বলে তাকিয়ে দেখো—রূপ থাকলেই হয় না, গুণ থাকা চাই, সকলকে ভালবাসতে শেখা চাই ! শুধু শুধু রাণী হবো বল্লেই হয় না, এসব গুণ যাতে পাও তার চেষ্টা কর। তখন লোকেই রাণী করবে, নিজে চেঁচাতে হবে না রাণী, রাণী—করে। রাগে, দুঃখে, অপমানে ঊর্মিমালার চোখে জল এসেছে। রাণী তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বল্লে : খুব কি লেগেছে ভাই ? চল আমার ঘরে পাখার তলায় বসে একটু বিশ্রাম করবে। আমাদের অতিথি হয়ে তুমি এত কষ্ট পেলে আমাদেরই লজ্জা হবে যে। তারপর ইঁদুরকে বল্লে : এক কাপ গরম দুধ দিয়ে যাও তো !

সেদিন এদের যত্ন আদরে ঊর্মিমালার কেটে গেল। সে কিন্তু আর কিছু বলেনি।

খেলাঘরে রাত ভোর হলে দেখা গেল—ঊর্মিমালা নেই—যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে চলে গেছে।

পুরোনো যায়গায় ফিরে এসেছে ঊর্মিমালা। কিন্তু খেলাঘরের অন্য সব পুতুলরা আশ্চর্য হয়ে গেল যে তার স্বভাব একেবারে বদলে গেছে। নিজেকে রাণী বলতেও চায় না, কটু কথাও বলে না, অনর্থক ঝগড়াও করে না।

একদিন দেখা গেল—উর্মিমালা বেণে-বউ পুতুলের খোঁপা বেঁধে দিচ্ছে। আবার একদিন দেখা গেল বাচ্চা পুতুলগুলোর জামা সেলাই করছে।

বেশ কিছুদিন কেটে গেল।

একদিন উর্মিমালা জানালার ধারে বসে কাফ্রি পুতুলের সঙ্গে গল্প করছে। এমন সময় ভালুক এসে বল্লে: একজন তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে সে নাকি পাপড়ির বন্ধু পাপিয়ার খেলাঘরে থাকে। আমি বল্লুম, দাঁড়াও রাণীকে জিজ্ঞাসা করে আসি। উর্মিমালা অবাক হয়ে বল্লে: রাণী কে? আমি তো উর্মিমালা।

হ্যাঁ তোমার নাম তাই—তবে যেদিন থেকে তোমার স্বভাবের পরিবর্তন হয়েছে সেই দিন হ'তে তুমি নিজে আপনা থেকেই আমাদের রাণী হয়েছো—একথা খেলাঘরের সবাই জানে। তাহলে আমাদের রাণীর কাছে—ওদের রাণীকে ডেকে আনি?

উর্মিমালা অবাক হলো—বল্লে: ডাকো।

উর্মিমালা অবাক হলো সত্যি। কিন্তু সত্যি সে এতদিনে রাণী হবার যোগ্যতা অর্জন করেছে। তাই রাণীর কাছে আজ যে বাড়ী সে গিয়েছিল সে বাড়ীর রাণী দেখা করতে এলো।

আর তাই এতদিন পরে আজ উর্মিমালার গুণে তাকে রাণী বলে স্বীকার করা হলো।

খেলাঘর তো নয়—একটি মসতো পরিবার—মায়ের মুখে, ঠাক্‌মার মুখে দোলা অনেকবার একথা শুনেছে। মায়ের পায়ে যদি একটা খেলনা-পুতুল কোনরকমে ঠেকে গেল তাহলেই ব্যস, অমনি সুরু হলো খেলাঘরের বাসিন্দাদের রূপ-গুণ বর্ণনা ও তারা কি কাজ দেয় সেই সমালোচনা। ঠাক্‌মা তবু বলেন আদর করে: আমার দোলন-চাঁপার খেলাঘর দেখ দেখি—ছেলে-মেয়েতে সারা পরিবার ঝলমল করছে। দোলন যখন বড় হবে তখন সত্যি সংসারও ওর এমনি হবে।

সংসারই বটে, কোনো পুতুল আর জীবজন্তু-পুতুল বাদ নেই। বেড়াল, কুকুর, ইঁদুর পর্যন্ত। ইঁদুরটাকে দেখলেই দোলার হাসি পায়। একটা মোটাসোটা ছোট ইঁদুর, দম দিলেই পাগলের মত ছুটোছুটি লাগিয়ে দেয়—বাবাঃ, যেন পাগলা ইঁদুর। ইঁদুরটাকে দোলা জানালার ওপাশে দেওয়ালের গায়ে ঠেকিয়ে রেখে দিয়েছে—

তার পাশেই একটা নর্দমা ছোট, ঘরে জল ঢাললে—ঐখান দিয়ে সহজে বেরিয়ে যায়।

সেদিন রাত্রে দোলা যখন ঘুমুচ্ছে, পুতুলরা সব জেগে উঠলো—। ওদের কাজই-তো এই, মানুষরা ঘুমুলে ওরা জাগে। ভালুক মেসো, হাতী খুড়ো, হাঁস-গিন্নী, চোখপিটপিটে খরগোস, বৌ-পুতুল, ব্যাণ্ড-বাজানো পুতুল, ডলি আর কালো-কুচ্ছিত কাফ্রি-পুতুল সবাই উঠে চা খেতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। ইঁদুর তখন ভালো করে ওঠেনি, আড়মোড়া ভেঙ্গে হাই তুলছে—হঠাৎ দেখলো নর্দমার ফুটো দিয়ে সরু লম্বা শক্ত চুলের মত কি দেখা যাচ্ছে আর মনে হচ্ছে ওখানে যেন কারা কিচমিচ শব্দ করছে। ইঁদুরের আর আলস্যি ভাঙ্গা হলো না, বিছানার উপর উঠে বসে দেখলো : হঁ্যা ওখানে ওদের জাতভাই কেউ এসে থাকবে।—ওঃ তোমাদের বলতে ভুলে গেছি, এই ইঁদুরটার নাম হলো মন্টি। হাতী খুড়ো ওকে নেংটি বলে ডাকলে ও খুব চটে যেত, তাই সবাই ওর নাম দিয়েছে মন্টি !

মন্টি আস্তে আস্তে সেই নর্দমার মুখটা দিয়ে এগিয়ে গেল—ওমা! ঠিকই তো ছেলেমেয়ে নিয়ে সত্যি সত্যি জ্যান্ত একটা বড় ইঁদুর নর্দমার ওদিক দিয়ে মুখ বাড়াবার চেষ্টা করছে। মন্টি তাকে অভ্যর্থনা জানালো : এসো এসো ভাই, তোমায় খুব ভালো লেগেছে—তা এখানে দাঁড়িয়ে কেন ?

—কি জানি ভাই, ভেতরে যেতে সাহস হচ্ছিল না, অনেকে রয়েছেন—কিন্তু ক'দিন ধরে তোমায় দেখছি আসবো আসবো ভাবছিলাম।

—বেশ করেছ, আমি ডাকি দাঁড়াও সকলকে, ও বৌ-পুতুল, হাঁসগিন্নি, খরগোস, দেখ আমাদের বাড়ী আজ অতিথি।

বৌ-পুতুল এগিয়ে এলো : এসো এসো, একেবারে চায়ের টেবিলে চলো। জ্যান্ত ইঁদুরকে অত অভ্যর্থনা করা হাতী খুড়ো, ভালুক মেসোর একটুও ভালো লাগেনি। সামান্য একটু হেসে বললে : এসো বসো

বসো, কই রে ডলি চা ঢেলে দে।—তারপর চুপি চুপি নিজেরা বলাবলি করতে লাগলো: আমাদের পুতুলের সংসারে এসব কেন বাপু, মন্টিকে সাবধান করতে হবে, নিজেদেরও হুঁসিয়ার হতে হবে। হাঁসগিন্নী ফিসফিসিয়ে বল্লে: কিচমিচ করতে করতে কখন কুট করে কার গায়ে কামড় দেবে তার ঠিক নেই।

কুচ্ছিত কাফ্রি পুতুলটা বল্লে: কি বলছো মাসী বলে দেবো ?

হাঁসগিন্নী বললে: তা বলবে না ? যেমন চেহারা তেমন বুদ্ধি।

মন্টি ছেলেমেয়েসুদ্ধ মাকে নর্দমা পার করে পৌঁছে দিয়ে এলো, আপনা-আপনি লোক, তাছাড়া পড়শী হলাম—বুঝলে ?

মন্টি ঘাড় নেড়ে বললে: নিশ্চয়ই আসবো, তোমরাও মাঝে মাঝে এসো।

হাঁসগিন্নী কি যে মন্তর দিয়েছে—পরের দিন থেকে চা খাবার পর কেটলীতে গরম জল করে সেই নর্দমার মুখে ঢালতে আরম্ভ করলো ভালুক মেসো। ছোট ছোট পুতুলগুলো সব ছুটে এসে বল্লে: কি করছো মেসো, গরম জল ঢালছ কেন ?

—হুঁ হুঁ বুঝিস না তো জ্যান্ত ইঁদুরের আসা যাওয়া আরম্ভ হয়েছে। কোন সময় কাকে কুট করে কেটে দেবে আর সব ফেঁসে যাবে, নাও—তখন হাসপাতালে যাও, না হলে পড়ে থাক বিছানায়। ওসবে দরকার নেই, তার চেয়ে ওদের আসা বন্ধ ভালো—কি বল হাতী খুড়ো।

খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে হাতী খুড়ো বললে: তা তো বটেই।

ও পক্ষের আসা তো মোটামুটি বন্ধ হলো—কিন্তু বেশ কয়েক দিন পরে সেজে-গুজে এসে মন্টি বললে:—দাও না বৌ-পুতুল আমার চাবিটায় দম দিয়ে, আমি একটু বেড়াতে যাবো।

বৌ-পুতুল দম দিতে মন্টি নর্দমা দিয়ে ছিটকে চলে গেল একেবারে পড়শীর ঘরে।

—ওমা এসো এসো—আমি তো আর যেতে পারিনি, দেখ না বাচ্চাদুটোর অসুখ, মেয়েটার ফ্লু হয়েছে আর ছেলেটা কোথায় কোন বাজে খাবারে মুখটুক দিয়ে থাকবে—পেটের ব্যথায় দু'দিন নড়তে পারছে না। আমি তো ওদের নিয়ে বাড়ীতে বসে আছি। ইঁদুর-গিন্নী একথা বলে মন্টিকে মেয়ের কাছে নিয়ে গেল।

মন্টি তার কপালে হাত দিল, জ্বর ছেড়ে গেছে—'খাবো খাবো' করছে। একটু আদা দিয়ে চিঁড়ে-ভাজা করে দিলে হয় তো।

কথাবার্তা শেষ করে উঠে দাঁড়াতে মন্টি দেখলো আর চলতে পারছে না। কি হলো—ভেবে পিছনদিকে তাকাতেই দেখে, রোগা মেয়েটা তার দম দেওয়ার চাবিটা নিয়ে কখন খেলতে আরম্ভ করেছে, ভাগ্যি হারায়নি কি মুশকিল, কি মুশকিল হতো তাহলে।

মন্টি ফিরে এসে বৌ-পুতুলকে সব গল্প করলো—মেয়েটার অসুখ জানলে ফলমুল কিছু নিয়ে যেতো—কিন্তু কিছুই তো জানে না। বৌ-পুতুল বললে : তাহলে তুমি বাপু বেশি যেও না। জ্যান্ত যারা তাদের সঙ্গে আমাদের বেশি মেলামেশা না করাই ভালো নয় কি? ভালুক মেসো হাতী খুড়ো এই সব বলাবলি করে।

কিন্তু হলে কি হয়, একতলার ইঁদুরগিন্নী খুব আসা-যাওয়া সুরু করলে—বেশ ভাবও জমে উঠলো। ভালুক-মেসো, হাতী-খুড়োর কথা আর যেন টিকছে না। বৌ-পুতুলকে ইঁদুরগিন্নী একদিন নেমন্তন্ন করে গেল—নর্দমা রীতিমত যাতায়াতের পথ হয়ে পরিষ্কার হলো। বৌ-পুতুল অবশ্য ঘরসংসার ফেলে যেতে পারেনি—তবে যাবো—একথা বলেছে।

এদিকে রাত বেড়ে গেলো—সকলের খাওয়াদাওয়া শেষ হলো মন্টির কিন্তু আসবার নাম নেই। বৌ পুতুল অপেক্ষা করে করে শেষে ভয় পেলো—কি জানি মন্টিটা যা দুরন্ত আবার কোথায় গিয়ে ছিটকে পড়লো কিনা। কিন্তু এখন কাকেই বা পাঠাবে—তাছাড়া হাতী খুড়ো, ভালুক মেসো যদি জানতে পারে—তাহলে তো এখনি অনর্থ

বাধাবে। অনেক ভেবে বৌ-পুতুল খরগোস আর ব্যাগু বাজানো পুতুলকে ডেকে বললে : দেখ তো ভাই তোমরা একটু নীচের তলায় গিয়ে খোঁজ নিতে পারো কি না।

ওরা বললে : কি করে যাবো ? ঐ ছোট্ট রাস্তা ওখান দিয়ে আনা-গোনা করা আমাদের সাধ্য কি ? ঢুকতেই পারবো না।

বৌ-পুতুল ওদের দিকে তাকিয়ে ভাবলো : তাইতো খরগোসটা যা মোটা হয়ে উঠেছে দিন দিন। আর ব্যাগু বাজানো পুতুল অত জিনিস পত্তর নিয়ে যাবেই বা কি করে ? তাহলে কি করা যায় ?

খরগোস বললে ভাবছো কেন বৌদি, মুড়কী পুতুলদের ডাকো— তিন চারটে আছে, দল বেঁধে চলে যাবে !

—সেই ভালো !

মুড়কী-পুতুলদের খুশির সীমা নেই---তিন জনেই ছুটলো। কিছুক্ষণ বাদে এসে বললে : মন্টি নীচে ওদের কাছে থির হয়ে বসে আছে—ওর দম দেওয়ার চাবি হারিয়ে গেছে, আসবে কি করে ? দেখ, এখানে চাবি কোথায় আছে—নিয়ে গিয়ে দিয়ে আসি ! অনেক খোঁজাখুঁজির পর চাবি পাওয়া গেল এবং সেটা নিয়ে ওরা আবার ছুটলো নীচে !

বেশ খানিকক্ষণ পরে মন্টি আর মুড়কী-পুতুলরা ফিরে এলো— ওদের হাতে অনেক খাবার-দাবার। ইঁদুরগিন্নী মুড়কীদের পেট ভরে খাইয়েছে তো বটেই আর উপরেরসকলের জন্যে অনেক খাবার পাঠিয়ে দিয়েছে। প্রত্যেকের নাম করে বলেছে। ইঁদুরগিন্নীর মনিববাড়ীতে সেদিন জন্মদিনের ভোজ ছিল তাই ভালো খাবার-দাবার হয়েছিল। ইঁদুরগিন্নী আর তার ছেলেমেয়েরা সবাই মিলে রান্নাঘর থেকে প্রচুর খাবার সরিয়েছে—পোলাও, মাংস, চপ, কাটলেট, কত রকম সন্দেশ, ফলমুল কিছু বাদ নেই।

মন্টি বল্লে : ভাগ্যিস, তুমি মুড়কীদের পাঠিয়েছিলে বৌদি, নৈলে আজ আমায় থাকতে হতো ওখানে। ওদের ঘর খুব অন্ধকার আর

এত জিনিসপত্রে চাপা যে আলো হাওয়া নেই। কিন্তু ওরা খুব ভালো পরিবার।

বৌ-পুতুল আবার সবাইকে খাবার টেবিলে ডেকে সব কিছু ভাগ করে দিল।

ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে হাতী আর ভালুক বললে : বাঃ, বাঃ, অনেক দিন পরে ভালো খাবার খেলুম—মন্টিটার বুদ্ধি আছে, বেশ ভালো পরিবারের সঙ্গে খাতির জমিয়েছে। গরম জল ঢালা উচিত হয়নি! যাক আজ থেকে ওদের সঙ্গে ভাব করো বৌ-পুতুল, বুঝলে? আর একদিন ওদের নেমন্তন করে এসো, ভালো করে রেঁধে বেড়ে খাওয়াও।

খরগোস আর উঠতে পারছিল না। ব্যাণ্ড-বাজানো পুতুল বলে উঠলো : বড্ডো খেয়েছিস বুঝি?

পুঁতির চোখ দুটো চকচক করে উঠলো খরগোসের—বললে : তুমিই বা কি কম খেলে?

বৌ-পুতুল ধমকে উঠলো যাও যাও, সব শুয়ে পড়োগে—সকাল হতে আর বেশি দেরি নেই।

মন্টি তখন মনের সুখে গান ধরেছে।

এই যে এত ব্যাপার ঘটলো দোলা কিন্তু কিছুই জানতে পারলো না। হ্যাঁ, এখন ওপরতলা নীচেরতলা দু'দিকের পরিবারে খুব ভাব হয়ে গেছে বৌ-পুতুল ভাবছে কবে ওদের নেমন্তন করবে। আর কি কি রান্না করবে।

যাবে নাকি নেমন্তনে?

খেলাঘরের রেশমী পুতুলটা সেদিন সবাইকে বড্ড জ্বালাচ্ছে? কি তাকাচ্ছ যে চোখ বড় করে? ওর নাম শুনে? হলে কি হয়—ওর চুল দেখেই না অন্য পুতুলরা ওর নাম রেখেছে রেশমী। সত্যি হিংসে করবার মতই চুল ওর। পুতুলদের কেন মানুষদেরও হিংসে হবে।

কিন্তু তা নয় হলো—রেশমী কিন্তু বড্ড দুষ্টুমী শুরু করেছে। ঠিক দুষ্টুমী নয়—খুনসুড়ি যাকে বলে। চুল ধরে টানা, ওর ল্যাজ মুলে দেওয়া, হাতীর শুঁড়ে চিমটি কাটা, নাবিক পুতুলটার নৌকাখানা লালমাছের গামলার জলের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া এমনি সব কাণ্ড! বকুনি খাচ্ছে হাতী মেসো, ভালুক খুড়োর কাছে,—কিন্তু হলে কি হয়—রোগ ছাড়ছে না।

মনোরমা বৌ পুতুল বলে: আহা ছেলেমানুষ—একটু অমন করলেই বা?

ভালুক শুঁড় উল্টে বলে: বোঝনা তুমি মনোরমা—বড্ড বেচাল হয়ে যাচ্ছে ওর।

রেশমী খিলখিল করে হেসে ওঠে।

সেদিন হয়েছে কি খরগোসটা সটান হয়ে শুয়ে পড়েছে—উঠতে পাচ্ছে না। রেশমী খবরদারি করে বেড়াতে বেড়াতে বল্লে: কি রে পলটু তোর হলো কি—উঠছিস না যে? চা খাওয়া শেষ হয়ে গেল।

কাঁদ কাঁদ হয়ে পলটু বল্লে: দেখনা রেশমী দিদি, আমি উঠতে পাচ্ছি না নড়তেও পাচ্ছি না—দম নেই।

তাতে কি হয়েছে, আমি চাবি ঘুরিয়ে দিচ্ছি—তাহলে ঠিক লাফিয়ে চলতে পারবি।

পলটুর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো—কান্না জড়ান গলায় বল্লে: তাহলে তো ভালো হোতো কিন্তু চাবিটাই তো হারিয়ে গেছে। আমি যে এখন কি করি?

সেপাই পুতুলটা খটখট করে এগিয়ে এলো—আরে হয়েছে কি পলটু? য়্যাকসিডেণ্ট? এম্বুলেন্স—এম্বুলেন্স ডাকি? ধমকে উঠলো বৌ পুতুল: হতচ্ছাড়া সেপাই সর্বদা মিলিটারী মেজাজ নিয়ে ঘুরছে, যাট যাট পলটুর দুর্ঘটনা কেন ঘটবে—যতসব ইয়ে—

রেশমী বল্লে: কিছু হয়নি গো সেপাই দাদা, এম্বুলেন্স না ডেকে একটা দম দেবার চাবি যোগাড় কর দিকিনি, পলটুর সব অসুখ ভালো হয়ে যাবে।

কাছেই লালরংএর মোটর গাড়াটা ছিল—সেপাই তার বন্দুক নামিয়ে গাড়ীর চাবিটা খুলে নিয়ে রেশমীর হাতে দিয়ে দিলো।

পলটু তখন পড়ে আছে—উঠতে, নড়তে, হাত-পা চালাতে কিছুই পারছে না—ওর রকম দেখে ভ্যাবলা পুতুলটা বলে উঠলো: পক্ষাঘাত হয়েছে বুঝি? বলার সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের পানের লাল রস টসটস করে গড়িয়ে পড়লো দু' গালের পাশ দিয়ে।

মনোরমা রাগ করে বলে উঠলো—ভ্যাবলা তো ভ্যাবলাই, এখনও ভদ্রতা শিখলো না।

হাতী গম্ভীর গলায় বল্লে: তা হোক কিন্তু বড় সরল। রেশমী ততক্ষণে চেষ্টা করছে কি করে চাবি ঘুরিয়ে পলটুকে ওঠানো যায়,

চালু করা যায়। কিন্তু নাঃ এ চাবিটা বড়, গায়ে লাগছেই না। পাখনা নাড়া হাঁসগিন্নি তখন বাথটবে রাখা জলের দিকে যাচ্ছে—যদি একটু সাঁতার কেটে নেয়ে-ধুয়ে আসতে পারে। তাকে দেখে রেশমী বল্লেঃ দাওনা মাসী তোমার চাবিটা। পলটুকে দম না দিলে নড়তে পাচ্ছে না।

হাঁসগিন্নি হলদে ঠোঁট খুলে আকাশ পাতাল হাঁ করে বল্লেঃ বলিস কি রেশমী আমরা আজ বাদে কাল মরবো, বয়সের গাছ পাথর নেই, আমার চাবি নিয়ে ঐ ক্ষুদে ছোঁড়াটাকে চালু করবি? তোর যা বুদ্ধি হচ্ছে বাছা, যা, যা ওদিক পানে যা, দেখ ওর মত ছোটখাট কেউ যদি থাকে। আমি এখন গঙ্গা নাইতে চল্লুম। এবার রেশমীর রাগ হয়ে গেল—আশে পাশে ছোট ছোট যে বিলিতী পুতুলগুলো ছিল—তার মধ্যে ঐ যে পুতুলগুলো একদল ব্যাণ্ড বাজাচ্ছে—তাদের চাবি নিয়ে চলে এলো সোজা পলটুর কাছে। তারা হাঁ-হাঁ করে উঠলো! কিন্তু রেশমী সে কথায় কান দিল না। কিন্তু পলটুর কাছে এসে দেখলো—ইতিমধ্যে তার কাছে মোটরবাইক চালিয়ে যায় সেই পুতুলটা এসে গেছে আর তার চাবিটা দিয়ে পলটুকে জোরে দম দিচ্ছে—। পুরোদম হওয়া মাত্র—পলটু লাফিয়ে উঠেই মোটর-বাইকের মত গর্জন করে ছুটে চললো। আরে আরে শুরু হলো কি—মনোরমা বলে উঠলো। সেপাই পুতুলটা বল্লেঃ য়্যাকসিডেণ্ট!

খেঁকিয়ে উঠলো বেণে বৌ পুতুলঃ—কেবল এক কথা সেপাইটার। অমঙ্গল টেনে আনা।

হাতী বল্লেঃ ওদিকে তো ছিটকে গিয়ে কোথায় পড়েছে পলটু ঠিক নেই।

ভালুক বল্লেঃ যেমন কাজ—এর চাবি ওকে দিলেই অঘটন ঘটবে। আরে বাপু তাহলে তো একটা চাবিতেই কাজ হতো, প্রত্যেকের আলাদা চাবির দরকারই বা ছিল কি? নাও এখন পলটুর জন্য কি করবে কর!

—সত্যিই য়্যাকসিডেন্ট ঘটলো নাকি? হাতীর মোটা গলা শোনা গেল।

—ওসব তোমাদের কর্ম নয়, আমি দেখি—বলে ঘোড়া টগবগ করে করে ছুটলো দুর্ঘটনার জায়গায়।

হাত পা নিথর করে শুয়ে আছে পলটু। মাথায় লেগেছে, হাতে পায়েও চোট পেয়েছে। ঘোড়া বল্লে: অন্যের চাবিতে দম খেলে তো কষ্ট। ওরা দৌড় দিয়ে হাঁটে, চালায় ফুল স্পীডে। ওসব কি আমাদের পোষায়! আমার পিঠে চড়িয়ে তোমায় খেলাঘরে নিয়ে যাই চল—তারপর যা হয় দেখছি।

খেলাঘরের কাছে পলটুকে নিয়ে এলো ঘোড়া। এরি মধ্যে রেশমী একটা চাবি যোগাড় করেছে—তা লাগিয়ে দেখবে বলে। কিন্তু পলটুর অবস্থা দেখে রেশমী কিন্তু আর কিছু না বলে রেল ইঞ্জিনের চাবিটা নিয়ে বেড়ালটার পিছনে দম দিলে। বেড়ালটা ইঞ্জিনের মত ঘুরে ঘুরে চলতে লাগলো। কিন্তু স্পীড খুব বেশি, তাই তার খুব কষ্ট হচ্ছিল। ক্রমশঃ অবশ্য কমে এলো।

নৌকা চালিয়ে যায় ঐ নাবিক পুতুলটা আসামাত্র, রেশমী ইঁদুরের চাবি দিয়ে দম দিলো। সঙ্গে সঙ্গে ইঁদুরের মত সে এঘর ওঘর ছুটতে লাগল।

—হলো কি, হলো কি? ভারী গলা হাতীর শোনা গেল।

—অমন ছুটোছুটি লাগিয়েছে কে হে—ভালুক বলে উঠলো।

সেপাই চেঁচিয়ে উঠলো: য়্যাকসিডেন্ট, য়্যাকসিডেন্ট—এম্বুলেন্স।

ধমকে উঠলো নাকের নথ নাড়া দিয়ে বেণে বৌ পুতুল: হতচ্ছাড়া সেপাই—কেবল অলক্ষুণে কথা। বলি ও মনোরমা দেখ না, ওটার হলো কি?

—ওমা, আমি ভেবেছিলাম বিকেলে আজ নৌকা করে বেড়াতে যাবো তা ও কি পাগলামি সুরু করলো? মনোরমা বল্লে।

পলটুর তখন দম ফুরিয়ে গেছে—খোঁড়াতে খোঁড়াতে ধীরে ধীরে এসে বল্লে : আর বলো না মামী, এসব রেশমী দিদি করছে। আমার চাবি হারালো আর তাই নিয়ে রেশমীদির দুষ্টুমীর অন্ত নেই।

নাবিক পুতুলের ছোটাছুটি তখন থেমেছে। হাঁফাতে হাঁফাতে বল্লে ! উঃ ভারী দুর্ভোগ ভুগিয়েছে দেখছি, কার চাবি দিয়ে রেশমী আমায় এমন করলে ?

ইঁদুর বল্লে : ঐ পলটুকে বলো নিজের চাবির ঠিক রাখে না আর তার জন্যে সবাই নাকাল হয়।

সেদিনের মত সকলে রেহাই পেলো। হাতী মেসো আর ভালুক খুড়ো সেদিন রেশমীকে খুব বকেছে আর ছোটরা ধর্মঘট করেছে কেউ রেশমীর সঙ্গে কথা বলবে না। পলটু বলেছে : ধর্মঘট করলেই সব ঠিক হবে।

সেপাই বল্লে : ধর্মঘট কি—ষ্ট্রাইক বলো।

সাতদিন কেউ রেশমীর সঙ্গে কথা বললো না দেখে সে নিজে এসেই ক্ষমা চাইল—না : সে আর এমন করবে না। সবাই বল্লে—ঠিক আছে।

বেণেবৌ পুতুল সেদিন অনেক খাবার তৈরী করে খাওয়ালো আর মনোরমা বৌ রেশমীর চুল বেঁধে দিল—মস্ত খোঁপা দেখলে যেন বাঁধতে ইচ্ছে করে।

মাঝে মাঝে রেশমী আপন মনে খুব জোরে হেসে ওঠে। সবাই ছুটে আসে—কি হলো ? না কিছু না রেশমী বলে। আসলে চাবি বদলে ঘুরপাক খাওয়ানোর কথা মনে হলেই হেসে ওঠে।

পুতুলরা বলাবলি করে : নিশ্চয় রেশমীর মাথা খারাপ হয়েছে।

হাতী মেসো তো রাঁচিতে একটা চিঠি লিখে বসলো ওখানকার পাগলা গারদে রেশমীকে পাঠানোর জন্যে। রেশমী সব শোনে, দেখে আর জোরে হেসে ওঠে।

অবশেষে রাঁচি যাবার ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেল। সেদিন রেশমী করেছে কি—সবাই যখন শুয়েছে, দিনের আলো চোখে লাগছে আর সে সব চাবিগুলো যোগাড় করে এরটা ওকে, ওরটা তাকে করে দম দিয়ে দিয়েছে।

মনে কর ব্যাপারটা—অর্থাৎ ছবিটা! যেন ঝড় উঠলো, বাজ পড়লো, ভূমিকম্পের মত সাংঘাতিক ব্যাপার। ছুটোছুটি, হুড়োহুড়ি—এর ঘাড়ে ও, তার ঘাড়ে সে—বিশ্রী ব্যাপার।

শব্দ পেয়ে খেলাঘরের মালিক সাত বছরের রত্না ছুটে এলো—কি ব্যাপার তার এখানে। কিন্তু রত্না পৌঁছতে পৌঁছতে দম ফুরিয়ে গিয়ে সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। কেবল চোখ পিট পিট করে দুষ্টুমীর হাসি হেসে রেশমী নিথর হয়ে দেখছে।

রত্না কিছু বুঝলো না—খেলাঘরের জিনিসপত্র ছড়ানো ছিটকানো দেখে ভাবলো—কে এসে এমন করলো তার এখানে। তারপর কি মনে করে মস্ত বড় পুতুল রেশমীকে কোলে তুলে নিয়ে বল্লে: আজ থেকে তুমি আমার বিছানার পাশে শুয়ে থাকবে—আর তার পাশেই বাক্স থাকবে তোমার—দিনের বেলা থাকবার জন্যে। একদম কোথাও যাবে না, খেলাঘরেও এসো না। জানো তোমার বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে শিউলি দিদির ছেলের সঙ্গে—আর ক'দিন বাদেই শ্বশুরবাড়ী যেতে হবে, এখন আর দুষ্টুমী নয়! চলো, আজ আবার দর্জি আসবে—তোমার জামা-কাপড়ের মাপ নিতে।

রত্না রেশমীকে নিয়ে চলে গেল। অন্য সব পুতুলরা তাকিয়ে রইল আর ভাবলো চিঠি লেখাই সার হলো—রাঁচি যেতে হলো না রেশমীকে।

ওর ভাগ্যটা বেশ ভালই—বেণেবৌ আর মনোরমা বলে উঠলো।

খেলাঘরের পেতলের সেপাইটা অনেক দিনের পুরোনো হয়ে গলেও নীরু তাকে খুব ভালবাসে। সে যখন খুব ছোট ছিল তখন সপাইটার লাল-পোষাক তার খুব ভাল লাগতো, মাথার টুপিও বেশ, কন্তু হাতের বন্দুকটা তার আধভাঙ্গা হয়ে গেছে। সেটা অবশ্য তার দাষে—কারণ দিদির সঙ্গে মারামারি হয়েছিল আর রাগ করে সপাইটাকে ছুঁড়ে ফেলেছিল—তাই ওর উঁচু হয়ে থাকা বন্দুকের াধখানা ভেঙ্গে গেল। এর জন্যে নীরুর দুঃখের অন্ত ছিল না। যাই- হাক তবুও সে তাকে এত ভালবাসতো যে খেতে শুতে বসতে লিখতে ড়তে সেপাইকে সে সঙ্গে নিয়ে চলতো। খেলাঘরের ইঞ্জিনে তাকে সিয়ে দম দিয়ে ছেড়ে দিতো আর সেটা যখন সারা লাইনটা ঘুরে াসতো—নীরুর আহ্লাদের সীমা থাকতো না। গাড়ীটাও ঘুরতো ার নীরু তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতো আর হাততালি দিতো।

মা বলতেন পুতুলটাকে নিয়ে তুই কি যে করিস নীরু, ওটা যদি মুষ হতো!

নীরু চোখ বড় করে মায়ের দিকে তাকায় আর বলে : তুমি কি যে বল মা লাল সেপাইটা সব বোঝে সব জানে ঠিক মানুষের মত, ওকে তুমি পুতুল বলছো কেন ? মানুষ বলো !

মা হেসে বলতেন : তাই বুঝি—তা হোক তোমার পুতুল মানুষ হোক। নীরু বলতো : শুধু মানুষ কেন, কেমন গায়ে শক্তি দেখেছ ? একসঙ্গে অনেক লোককে ঘায়েল করতে পারে, কারুর সঙ্গে মারামারি হলে ও জিতে যাবেই।

সেপাইটা শুনতো আর গর্বে আনন্দে ওর বুক ফুলে উঠতো। সেদিন মা খাবার তৈরি করতে করতে নীরুকে ডাকলেন, বল্লেন আজ আমি খুব ব্যস্ত তুমি খেলতে যাবার আগে টেবিলে ঢাকা খাবার খেয়ে যেও।

—ব্যস্ত কেন মা ? কি করছো—নতুন খাবার তৈরী করছো ?

—হ্যাঁ তোমাদের জন্যে কেক তৈরী করবো তাই এইখান থেকে এখন যেতে পারবো না।

—কি মজা, কখন কেক তৈরী হয়ে যাবে মা ? কখন আমরা খাবো ?

মা বল্লেন—তৈরী হলেই খাবে।

টেবিলের ওপর সেপাইটাকে বসিয়ে রেখে নীরু খাবার খেতে বসলো আর মাকে বল্লে : খুব ভালো করে তৈরী করো—আমি আর সেপাই দুজনে খাবো—খেলা করে এসে খুব ক্ষিদে পাবে যখন তখন—কি বল লাল পল্টন ?

সেপাই-এর কথা কিছু শোনা গেল না—কেবল মা বল্লেন : তুমি ঘুরে এসো তো, তারপর সব হবে।

নীরু কথা বলতে বলতে অন্যমনস্ক হয়ে কখন বেরিয়ে গেছে, এদিকে পল্টন যে টেবিলের ওপরে বসে রইল তাকে পকেটের মধ্যে নেওয়া হলো না তা একেবারে নীরুর মনে হলো না।

সেপাই অনেকক্ষণ পথের দিকে তাকিয়ে রইল—ভাবল নীরু আমায় রোজকার মত পকেটে করে নিয়ে যাবে মাঠে! নীরুর পকেটে থেকেই সে মাঠে ছেলেদের খেলা দেখেছে—বল নিয়ে কি দৌড়াদৌড়ি কাড়াকাড়ি। সেপাই-এরও মাঝে মাঝে ইচ্ছে হতো পকেট থেকে বেরিয়ে ওদের সঙ্গে ছুটোছুটি করে কিন্তু নীরু প্রায়ই বলতো : আমি সেপাইকে নিয়ে যাই খেলা দেখবে বলে কিন্তু ওকে আমি বার করিনা, যদি কেউ নিয়ে নেয়—ঐখান থেকে খেলা দেখে দেখে ও খুব ভাল খেলা শিখে গেল।

সেপাই-এর মনে হলো এতই যদি নীরু ভালবাসে আজ ম্যাচের দিন সে বেমালুম তাকে ভুলে গেল কি আশ্চর্য! দুঃখ তো হচ্ছে রাগও একটু হচ্ছে না তা নয়। প্রাণপণ শক্তিতে সে দু'তিনবার চীৎকার করে ডাকলো : নীরু ও নীরু, শুনছো ও নীরু!

কিন্তু নীরু ততক্ষণে হয়তো মাঠে পৌঁছে গেছে। সেপাই যে চীৎকার করলো তা নীরুর কানেই গেল না, নিজে সে দু'-চারবার কেশে উঠলো আর শেষের নী....রু-উ-উ—ডাক দেবার সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা কেমন ঘুরে গেল। পড়বি তো পড় একেবারে নীচেই, যে পাত্রে কেক তৈরীর জন্যে ময়দা, ডিম ইত্যাদি মিশিয়ে তাল করে রাখা হয়েছিল সে জিনিসের ওপরে। পেতলের দেহ ওপর থেকে মেঝের পাত্রে বেশ জোরে পড়লো, দেহে লাগলো বটে তবে নরম তাল করা জিনিসটার ভেতরে গেঁথে গেল।

একী হলো? এ কোথায় পড়লুম? নীরু, নীরু কোথায় গেলে তুমি? কি করছো দেখ আমি কোথায় পড়েছি.—এখনি আমায় আগুনে দেবে।

কিন্তু কে শুনবে সেপাই-এর কথা। নীরু তখন ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে ম্যাচ খেলছে। আর দিনের বেলা পুতুলদের কোন কথাই শুনতে পাওয়া যায় না—যখন মানুষেরা ঘুমোয় তখন তাদের কথা-বার্তা খেলা-ধূলা কাজ-কর্ম চলে।

কেঁদে ফেলল সেপাই, অত শক্তি তার কিন্তু দিনের বেলা কোনো কাজেই লাগাতে পারে না—তাই নীরুও তার ডাক শুনতে পায় না।

খানিকবাদে মা এসে কেক্-এর জন্য নরম করে রাখা তালটাকে আগুনের মধ্যে দিলেন। সেপাই ভাবছিল মা নিশ্চয়ই দেখতে পাবেন আর পুড়ে যাওয়ার হাত থেকে সে রেহাই পাবে। কিন্তু মা-রও তখন অন্য কাজের তাড়াতাড়ি—তালটিকে নিয়েই আগুনের ভেতর দিয়ে চলে গেলেন।

আগুনে সেপাই ছটফট করতে লাগলো, চোখের জল গরমে শুকিয়ে গেল।—ক্রমশঃ চীৎকার কমে এলো—মরার মত পড়ে রইল। এই নির্মম অত্যাচার সহ্য করা ছাড়া উপায় কি ; পেতলের দেহ তার লালচে হয়ে কালো হয়ে এলো যখন—তখন মা এসে তালটাকে নিয়ে টেবিলে রাখলেন। কিন্তু গরমে আর তাপে তখন তার প্রায় মরে যাবার মত অবস্থা! আর একটু আগুনে থাকলেই তার সৈনিক জন্ম শেষ হয়ে যেতো।

এবার ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হয়ে আসছে কিন্তু হলে কি হয় কেক কাটলে তার রেহাই পাবার অনেক দেরী—কাজেই চুপ করে চোখ বুজে পড়ে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

খেলার মাঠ থেকে ফিরে নীরু অনেকবার তার সেপাইকে খোঁজ করেছে। অন্ততঃ বার পাঁচ-ছয় মাকে জিজ্ঞাসা করেছে—কোথায় গেল তার সেপাইটা।

মা বল্লেন—কোথায় ফেলেছো তার ঠিক নেই, হুঁস থাকে না একটুও, দেখো খুঁজে। মাঠে ফেলে এসেছো কিনা মনে করো।

নীরু অনেকক্ষণ খুঁজলো তারপর আবার মার কছে এসে বল্লে : কোথায় গেল মা ?

মা বল্লেন—আচ্ছা খুঁজে দেখবো এখন। এবার তুমি একটু কেক খাও, দেখ কেমন হয়েছে। একটা বড় ছুরি নিয়ে কেক-এর মধ্যে বসিয়ে দিলেন।

—উঃ!

আর্তনাদ করে সেপাই টেবিলের ওপর পড়লো, ঠক করে শব্দ হলো।

—মা! ঐ তো আমার সেপাই, তুমি ওকে আগুনে দিয়েছিলে।

মা অবাক হয়ে গেলেন—কখন যে ওটা ওর মধ্যে পড়লো তা কিছুতেই ভেবে পেলাম না।

—ইস্ কি রকম হয়ে গেছে দেখো—চেহারা বদলে গেছে। আমি ওকে চান করিয়ে আনি। নীরু বললে।

মা বললেন চান করালে হবে না, ওকে ব্রাসো দিয়ে ঘসে চান করাতে হবে।

সেপাই-এর চেহারা আগের চেয়ে অনেক ভাল হয়েছে—কাল চেহারা চকচক করছে—আর নীরু তার যত্নও বাড়িয়েছে—চোখের আড়াল করে না।

দিনেরবেলা ঘরে বেড়িয়ে আলাপ-আলোচনা শুনে রাত্রে খেলা-ঘরে এসে সেপাই খুব গর্ব করে বলে কি রকম য়্যাডভেঞ্চার করলুম—আমি সে সৈনিক তো নই—পুড়ে গিয়েও মরিনি। আমার মত শক্তি কার আছে?

খেলাঘরের অন্য পুতুলরা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে—সেপাই আসল কথাটা আর বলে না।

ঝগড়াটা লাগলো কোথায় জানো ? কোলকাতার মিউজিয়ামের ঘরগুলোয় পৃথিবীর সব দেশ থেকে, পুতুলগুলোকে এনে রাখা হয়েছিল—সেখানে।

অনেক দূর দূরান্তর থেকে সাগর পার হয়ে ওরা কোলকাতার মিউজিয়ামে এসে শোকেসে গিয়ে উঠলো।

পুতুলরা মনে মনে ভাবলো—এই মানুষগুলো ভেবেছে কি। আমরা যে সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পার হয়ে এলাম তা আমাদের সুবিধা-অসুবিধা আহার নিদ্রা কিছুই এরা দেখলো না কেবল কাঁচের মধ্যে বন্ধ করে রেখে 'অমুক তমুক দেশ' থেকে এসেছে বলে বেড়াতে লাগলো।

এই কি আদর আপ্যায়ন—? আমরা যে নিজের নিজের দেশ ছেড়ে ভারতবর্ষে এলুম—এই বুঝি আতিথেয়তা ? মনে মনে সবাই বেশ চটে গেল।

সারাদিন ঘর খোলা আছে আর রাজ্যের মানুষ ছেলে-মেয়ে এসে এ ওকে সে তাকে আঙ্গুল দিয়ে দেখাচ্ছে আর বলছে দেখ দেখ ভাই এই পুতুলটা কেমন ওর পোষাক কেমন চমৎকার ?

এছাড়া আর কথা নেই বুঝি? মানুষগুলোর মনে দয়া মায়া স্নেহ মমতা বুদ্ধি ওদের কিছু নেই।

একদিন রাত্রে দরজা বন্ধ করে সবাই যখন চলে গেছে—ঘুটঘুটে অন্ধকার—সেই সময়—ইরাণী পুতুল ইন্দোনেশিয়ার পুতুলকে ডেকে বল্ল: বলি ওগো শুনছো? বলবোই বা কাকে যেমন রোগা লম্বা ভূতের মত চেহারা—তোমায় মানুষগুলো অতদূর থেকে কেন এনেছে মরতে? ঐ ভূতের মত চেহারা না দেখলেই নয়, ভাগ্যি রাতে তোমায় অন্ধকারে কেউ দেখে না, তাহলে ভয়ে মরে যেতো!

তাই নাকি? ইন্দোনেশিয়ার ভূত চেহারার পুতুল মুখ বাড়িয়ে বল্লে: তা তোমার কি বলবার আছে বল? ভূত চেহারা না হয় আমার কিন্তু তুমি তো ভারী অদ্ভুতের মত কথা বলছো।

ঝাঁজিয়ে উঠলো ইরাণী পুতুল: আ গেল যা, কথা বলার ছিরি দেখ—যেমন চেহারা তেমনি তো হবে।

দাঁত বার করে হেসে উঠলো ইন্দোনেশিয়ার পুতুল, বল্লে: বা যুক্তি মন্দ নয়, তখন থেকে গালাগালি করছো আর আমিই হলাম মন্দ?

এগিয়ে এলো রেড ইণ্ডিয়ান টগবগ করে ঘোড়া ছুটিয়ে—পায়ে চামড়ার ভারী জুতো: আরে ব্যাপার কি তোমাদের রাগারাগি কিসের?

আমায় বলে কিনা অদ্ভুত, এই দেখ আমার ঝলমলে পোষাক আর সুন্দর মোমের মুখ—আমি হলাম অদ্ভুত আর ঐ লম্বা রোগা চেহারা উনি হলেন ভালো—কথা শোনো একবার: ইরাণী বল্লে।

রেড ইণ্ডিয়ান বল্লে: বিদেশে এসে এমনি করে ঝগড়া করে নাকি—যাও যাও নিজের নিজের যায়গায়।

ইন্দোনেশিয়ার পুতুল হেসে বল্লে: আমার মনে হচ্ছে ইরাণীর ক্ষিদে পেয়েছে।

ছিটকে গেল যেন ইরাণী, যদি পেয়ে থাকে তাতে তোমাদের কি ? তোমরা তো আর ব্যবস্থা করতে পারবে না এই যে ক'দিন এসেছি— কি করেছ তোমরা ? মানুষগুলো তো কেবল সাজিয়ে রেখেছে আমাদের। উঃ এত মাথার যন্ত্রণা—একটু চা পেলে—

রেড ইণ্ডিয়ান বল্লে: তাই বলো, চা চাই ? বাংলা দেশের দার্জিলিং জেলা থেকে কেউ এসেছে কি ? দেখ তো হে ইন্দোনেশিয়ান, একটু চা যোগাড় করতে পার কিনা।

তারপর রেড ইণ্ডিয়ান নিজেই ঘোড়া ছোটালো, বল্লে: আহা থাম, থাম আমি দেখছি, দু'মিনিটে সারা বাড়ী ঘুরে আসবো।

ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনে অন্ধকারে কোণ ঠাসা হয়ে মশার কামড় খাওয়ার হাত থেকে গা ঝাড়া দিয়ে বেরিয়ে এলো ভুটানী পুতুল। নাক চ্যাপটা গায়ে পেতলের গয়না—কাপড় যেটা পরেছে সেটা শাড়ী না সতরঞ্চী বুঝতে পারা যাচ্ছে না। পিঠে লম্বা ধরণের ঝুড়ি আটকানো তোমরা যারা দার্জিলিং অঞ্চলে গেছ তারা আন্দাজ করতে পারবে।

দাঁড়ালো এসে ঘোড়ার সামনে। ঘোড়া ধরা অভ্যাস ওদের খুব আছে কিন্তু মুস্কিল হলো কেউ কারুর কথা বুঝতে পাচ্ছে না। ঝুড়ি দেখে রেড ইণ্ডিয়ান চায়ের সন্ধান করতেই চা পাওয়া গেল। তখন তাকে শুদ্ধ ঘোড়ায় উঠিয়ে নিয়ে চট করে এলো ইরাণীর কাছে। ইতিমধ্যে পোল্যাণ্ডের পুতুল এসেছে সেখানে—গায়ে খুব দামী পোষাক—নাচ গান করতে ভালবাসে সে। তাই সুরু করে দিয়েছে। ওকে দেখে অবাক হয়ে বোধহয় ইরাণীর মাথার যন্ত্রণাটা হঠাৎ কমে গেছে।

ওরা আসতেই পোল্যাণ্ডের পুতুল নাচ থামিয়ে বল্লে: যাঃ ডিসাটর্ব হয়ে গেল। কেই বা দেখছে, বুঝবেই বা কে ? একি আমার দেশ !

হাইল্যাণ্ডের সুন্দর পুতুল ইতিমধ্যে এগিয়ে এসেছে: কেন আমরা কি পুতুল নই, বুঝতে পারবো না ? কি এমন দেখাচ্ছ, আমরা খুব

জানি নাচ গান করতে বুঝলে? আরে ওটা কে, আলমারী থেকে বেরুচ্ছে?

—আমি এসেছি হংকং থেকে, ন্যাকড়ার পুতুল আমার নাম। কিন্তু দেখতো আমাকে কি সুন্দর সেলাই করা হয়েছে—দেখ! এগিয়ে এসো! পারবে তোমরা? তোমাদের কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রি এসব পারবে?

—তুমি তো বাপু বড্ড ঝগড়াটে, এসেই ঝগড়া করছো? বিদেশে এসেছ, তা মিলে মিশে থাকবে—এক জায়গায় যখন এতগুলো পুতুল জড় হয়েছে, তা না ঝগড়া শুরু করলে। কি যে কর—!

খট খট করে এগিয়ে এলো দক্ষিণ ভারতের রং চটা কাঠের পুতুল।

—আরে তাই বলো, তোমার চেহারা এমন হয়ে গেছে, না এমনই দেখতে তুমি? কি বলো তো? গা'টা একটু রং করিয়ে নিতে পারো না? প্রসাধনের দরকার সকলেরি আছে। মানুষ আর পুতুল কারুর প্রভেদ নেই। সভ্য সমাজে বাস করো—এসব ভুলে যাও কেন? বলে উঠলো হংকংএর পুতুল—আমার ভাই এত সাজগোজ আসে না, এই বেশ আছি। তাছাড়া বয়স বেড়েছে—যাক কি বলছিলে তোমরা? চায়ের আয়োজন হয়েছে? তোমরা চা খাও—বলোতো করেও দিতে পারি—কিন্তু শোনো—গলার স্বর আরো নামিয়ে রং চটা পুতুল বল্লে, আমার ভাই একটু চাটনী খেতে ইচ্ছে, তেঁতুল পাওয়া যাবে?

—তেঁতুল? মানে tamarind বলছো তো? মুখে দিলে মুখ দাঁত পেটের ভেতর পর্যন্ত টক হয়ে যায়—সেই জিনিস—আরে ছোঃ। সৌখীন ফিটফাট চীনে মাটির তৈরী ইংল্যাণ্ডের পুতুল বলে উঠলো।

—যে যা ভালোবাসে তা নিয়ে কথা বলে কি হবে? তুমিও কিছু না কিছু ভালোবাসো—থ্যাবড়া মুখ নাদুস নুদুস চেহারা ফিনল্যাণ্ডের পুতুল বলে উঠলো। এতক্ষণ বাদে ভুটানী ইরাণীর কানে কানে বল্লে: দেখ, ইরাণী ওর মাথাটা কিসের উল দিয়ে বোনা বলে মনে হচ্ছে না?

উত্তর দিল ফিনল্যাণ্ড : হ্যাঁ উল দিয়ে বোনা তাতে হয়েছে কি ? যে দেশের যা—সে কি সে দেশছাড়া হবে ? এই দেখ আমেরিকান এসে গেল। কালো ক্লোক গায়ে ফেসানেবল আমেরিকান পুতুল বল্লে : ব্যাপার কি, গোলমাল কিসের ?

ব্যাপার সুবিধের নয় দেখে ইরাণী পুতুল মুখ বাড়িয়ে বল্লে : শুধু একটু চায়ের জন্যে ! মাথা ধরে মরে গেলুম, একটু চায়ের কত চেষ্টা করছি—কিন্তু গোলমালই কেবল বেড়ে চলেছে—চা পাচ্ছি না !

রোগা লম্বা ভূত চেহারার ইন্দোনেশিয়ান আবার এগিয়ে এসে বল্লে : আমি তো বল্লুম চা পেলে করে দিতে পারি—কই হে রেড ইণ্ডিয়ান—আমি চিনি দিচ্ছি।

—ইয়েস—কি চাই ? চা ? এই তো ভুটানী তো চা নিয়ে অনেকক্ষণ হাজির হয়েছে, আরো তো সব চাই।

পায়ে মোটা কাঠের জুতোর শব্দ করে এলো হল্যাণ্ডের পুতুল, বল্লে : আর কি চাও ? দুধ ? খুব আছে। আমাদের দেশে এত দুধ আর চিজ্ তাই খেয়ে অরুচি হয়ে গেছে।

তাতে আমাদের কি বল ? তুমি না হয় দুধ আর চিজ্ খেয়ে গয়লার গাইটি হয়ে আছ—।

—আবার ঝগড়া ? রেড ইণ্ডিয়ান বলে উঠলো।

—ক্রমশঃ রাগারাগি বেড়ে চলছে অথচ কাজ কিছু হচ্ছে না—থাইল্যাণ্ডের পুতুল মিহি সুরে বল্লে। উলে বোনা মাথা নেড়ে ফিনল্যাণ্ড তখন বলছে : এই থ্যাবড়া মুখো যা বলে তা ঠিক—কই হে এসো তো কে আছ ? আমায় একটু help করো দেখ সব তৈরী হয়ে যাবে।

লেশ বুনছিল আপন মনে বেলজিয়ামের পুতুল। এতক্ষণ কোন কথাই বলেনি সে—এবার লেশবোনা বন্ধ রেখে এগিয়ে এসে বল্লে, কাউকে কিছু করতে হবে না, আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে সব করে দিচ্ছি। তখন থেকে কেবল ঝগড়ার কথাই শুনছি।

ওদিকে তখন হংকংএর ন্যাকড়ার পুতুল ধমক লাগিয়েছে ইন্দো-নেশিয়ানকে : ঝগড়াঝাঁটি হচ্ছে সব—বিদেশে এসে ? আমরা এসেছি ভারতবর্ষে—এরা বলবে কি ? ঝগড়া থামিয়ে এসো মিলে মিশে সব করি।

ইন্দোনেশিয়ান বল্লে : ইরাণীর বাপু আদিখ্যেতা আছে—মাথা ধরেছে, মাথা ধরেছে বলেই অস্থির হয়ে ঝগড়ার সূত্রপাত করলো।

বেলজিয়ামের পুতুল তখন দক্ষিণ ভারতের রং চটা পুতুল আর বাংলা দেশের বেণেবৌ পুতুলকে ডেকে নিয়ে রীতিমত বসে গেছে চা তৈরী করতে। ভুটানীও সাহায্য করছে।

রেড ইণ্ডিয়ান পুতুল সবাইকে এক জায়গায় জড় হবার অনুরোধ জানালো। ইতিমধ্যে যারা আসেনি তারাও এসে পড়লো।

দেখ ভাই, চা খাওয়ার শেষে আমরা অনর্থক বাজে কথা না বলে নিজের নিজের দেশের পরিচয় দেবো। তাতে আমরা এক দেশের লোক অন্য দেশকে জানতে পারবো। আমাদের ভাবের আদান প্রদান দরকার—তুচ্ছ কারণে ঝগড়াঝাঁটি রাগারাগি এসব একেবারেই ভালো না।

—ঠিক কথা ঠিক কথা পোল্যাণ্ডের পুতুল বল্লে।

—আর হয়তো কখনও এক জায়গায় হবার সুযোগ পাবে না, দেখা শুনো হবার খুব সম্ভব নয়—তাহলে এসো চা খাওয়ার পর আমরা সভা করি !

—নিশ্চয়ই ! নিশ্চয়ই ! কোরাসে বলে উঠলো অন্য পুতুলরা। চা খাওয়ার পর ইরাণীর মাথা ধরা সেরে গেছে আর উৎসাহ এসেছে। তখন বিদেশে আসার জন্যে খারাপ লাগছে না ? সভার প্রথমেই সে বক্তৃতা আরম্ভ করে দিল—লেডিজ ফার্স্ট হিসেবে।

—ঝগড়া করা ভালো নয়। তা'হলে আমাদের দেশের তেল অন্য দেশে যাবে না। এরোপ্লেন, জাহাজ মটরগাড়ী সব অচল হয়ে যাবে—বড় বড় যে ট্যাঙ্ক তৈরী করা হয়েছে তাও মরচে ধরবে।

ইন্দোনেসিয়া থামিয়ে দিল ইরাণীকে—বল্লে: ঝগড়া কেন করতে যাবো? ভারতবর্ষের লোকদের সঙ্গে আমাদের বরাবর ভাব। আজ থেকে তো নয়। হাজার হাজার বছর আগে থেকে। এখানকার লোকেরা আমাদের দেশে গিয়ে কত মঠ মন্দির করেছিলেন। এই যে রামায়ণ মহাভারত—যা বলতে এরা অজ্ঞান হয়ে যায়—সন্ধ্যাবেলা মাটির প্রদীপ জ্বেলে সুর করে পড়ে—তার সব ছবি আমাদের মন্দিরের গায়ে আঁকা আছে। যেও একবার দেখে এসো।

রেড ইণ্ডিয়ান বল্লে: আর ক'বছর পরে হয়তো আমাদের দেখতেই পাবে না যে রকম দ্রুত আমাদের লোকজন সব কমে যাচ্ছে। এই সহরের ইঁট কাঠ দালান কোঠা এসব ভালো লাগে না। ক'দিনেই হাঁপিয়ে উঠেছি। বড় বড় গাছ, আকাশের নীচে ঘুরে বেড়াতেই আমার ভাল লাগে।

ভুটানী আঁচল দিয়ে মুখ মুছে বল্লে: বাবাঃ কি গরম এখানে—শীতের দেশে থাকি, আর কি আরাম। বরফের নামগন্ধ নেই, তুলোর মত বরফে রাস্তাঘাট গাছপালা ঢেকে যাবে, তা নেই। গরম জামা গায়ে দিয়ে দেখতে কি সুন্দর—তা না শেষ হয়ে গেলাম।

পোল্যাণ্ড বল্লে: দুঃখ কি আর সাধে হয়, জানো চিজের মত টুকরো হয়ে গেছে আমাদের দেশ? মনে হলে রাগে, দুঃখে আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না। তখন যদি জন্মাতাম দেখতাম কি করে ভাঙ্গতো।

থাইল্যাণ্ড বল্লে: আমরা কিন্তু সব দিকই ভালবাসি। যুদ্ধ করতেও জানি আবার নাচ গান বাজনা যাই বলো—তাক লাগিয়ে দিতে পারি।

হংকং বল্লে: আর বলোনা বিদেশী বণিকদের দেখলে আমার পিত্তি জ্বলে যায়। ভাগ্যি এখানে দেখতে পাচ্ছিনা। ওরাই হচ্ছে যত অনর্থের মূল। যুদ্ধ, বিগ্রহ, অশান্তি বাড়াতে পারে ওরা।

দক্ষিণ ভারত বল্লে: তা না হয় হলো—কিন্তু ভাই, তোমরা সবাই

বিদেশ থেকে এসেছ—শুধু কোলকাতা হয়ে চলে যাবে? আসল ভারতবর্ষ দেখতে চাও এসো আমাদের দেশে দেখবে পাথরে তৈরী কত সুন্দর মন্দির। এক এক খানা আস্ত পাহাড় কেটে মন্দির তৈরী হয়েছে। পৃথিবীর আর কোথাও এ জিনিস দেখতে পাবে না। একবার যদি যাও আর ফিরে আসতে চাইবে না।

ইংল্যাণ্ড বল্লে: এদেশে অনেক কাল কাটালাম—প্রায় দু'শো বছরের বেশি। ভাল কাজ করেছি সব সময় তা নয়—তারপর চলে যাবার সময় যখন এলো তখন বন্ধুর মত চলে গেছি।

ফিনল্যাণ্ড বল্লে: কেন সব হৈ চৈ করছ—অনেক কিছু বলছো শুনছি। শোনো, শোনো আমাদের দেশ খুব বড় নয়—কিন্তু বড় ভালো দেশ আমাদের। বাইরে থেকে যারা বেড়াতে গেছে তারা সবাই সুখ্যাতি করে। নিজের মুখে নিজেদের কথা আর কত বলবো। সমুদ্রের ধারে যদি বেড়াতে যাও তো দেখবে পাহাড়ের মত উঁচু নীল ঢেউ আর তাদের মাথায় সাদা ফেনা। অন্ধকার রাত্রে দেখ কেমন চকচক করছে। মন কেমন উদাস হয়ে যায়।

আমেরিকান: ওসব রাখো, গল্প গুজব পছন্দ হয় না, আমার কাছে 'টাইম ইজ মানি'।

হল্যাণ্ড: আমাদের দেশটা ভাই বড্ড নীচু। সমুদ্রের জল আর দেশের মাটি এক স্তরে। কখন যে জল এসে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে তার নেই ঠিক। তাই সবাই বাঁধ বেঁধে রেখেছে।

বেলজিয়াম: হ্যাঁ তোমরা আমরা তো পাশাপাশি থাকি। বন্ধুরা, তোমরা যদি ওখানে যাও আমাদের দেশেও ঘুরে এসো। আর আসবার সময় যত খুশী কাঁচের জিনিস বোঝাই করে এনো।

রাশিয়ান: আমাকে বুঝি তোমরা কেউই দেখতে পাওনি। তাই দেখছি চুপ করে,—আমার অস্তিত্ব আছে সে কথাও কেউ ভাবছো না। আমাদের দেশ হচ্ছে সব চেয়ে বড় দেশ, তা বলে ঘিঞ্জি নয়।

তোমরা যদি বেড়াতে আসো কারুর কোন কষ্ট হবে না। আমাদের দেশে বহু রকম জাতি আছে। কিন্তু খোঁজ করে দেখো সবার সেই এক পরিচয়—"আমরা রুশ দেশের লোক"। আমরাই আমাদের দেশ শাসন করি।

বাংলাদেশের বেণেবৌ পুতুল বলে উঠলো : সত্যি তো! তুমি কোথায় ছিলে কেউ দেখেনি তো। তোমরা ভাই সবাই তো সবাইকে নেমন্তন করলে—কিন্তু আমার যাওয়া হবে কিনা জানিনা। ঘর সংসার ফেলে, ছেলেপুলে, কর্তার শরীর ভাল থাকে যদি, ছুটী পাওয়া যায় যদি—এসব হলে তবে তো যাবো—কিন্তু না হলেও আমার দুঃখ নেই কারণ তোমাদের সবাইকে তো দেখলাম। আর বাংলা দেশ আমার বলে আমি গর্ব বোধ করি।

রবীন্দ্রনাথের কথা তোমরা শুনেছ? ইয়োরোপের লোকরা যাঁকে নোবল প্রাইজ দিয়েছিলো—সেই তিনি কি বলেছেন জানো?

"সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।" আরো—আরো অনেক কথা বলেছেন। থাক সে কথা তোমরা আমাদের অতিথি এখন চা খাবে চল—বাংলা দেশের পিঠেও খাওয়াব।

রাশিয়ান : আমার চায়ে ভাই চিনি দিও না বরং একটু পাতিলেবু থাকলে দিও।

চা ঢেলে দিতে লাগল বেণে বৌ। ঘোমটা খুলে গেছে মাথা থেকে—আবার আস্তে আস্তে গান ধরে উঠলো—সঙ্গে সঙ্গে সবাই কোরাসে গাইতে লাগলো :

ভায়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ
ওমা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি—
আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতেই মরি
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
সকল দেশের সেরা সে যে আমার জন্মভূমি ॥

* * *

একজিবিশন শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষের কাছে রাশি রাশি চিঠি আসতে লাগলো—ফিনল্যাণ্ড, রাশিয়া, পোল্যাণ্ড ইত্যাদির ছাপ। সবাই জানাচ্ছে টি পার্টির গানটা তর্জমা করে পাঠাও।

রাশিয়া প্রস্তাব করে পাঠিয়েছে: পুতুলদের মহাসভার পরবর্তী অধিবেশনে প্রস্তাব আনবে যে জাতীয় সঙ্গীতের বদলে আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের চলন হোক। প্রস্তাবটা বেশ ভালো বলেই মনে হচ্ছে—না?

বনের সরু পথটা ধরে মিকি একমনে চলছিল। সকাল বেলার রোদ্দুর বেশ লাগছে। তাছাড়া এটা তো শরৎকাল বর্ষা কেটে গেছে, আকাশ পরিষ্কার আর সেই নীল আকাশে বক মামারা দল বেঁধে চলে যাচ্ছে, বাতাসে কেমন একটা ঠাণ্ডা আমেজ। মিকি ভাবতে ভাবতে চলেছে—পুজোর বাজনা এই বেজে উঠলো বলে—ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে—নতুন জামা কাপড় পরে পূজো দেখতে বেরোবে। মানুষদের কত আনন্দ আর কত উৎসব—যে ওদের তার ঠিক নেই।

মিকি ভাবছে আর চলেছে সরু রাস্তা দিয়ে। হঠাৎ মিকির চোখে পড়লো চাঁদের আলোয় কি যেন দুটো চক চক করছে। লাফিয়ে মিকি সে দুটো তুলে নিলো—আরে কি সুন্দর এ দুটো! একেবারে সোনা নিশ্চয়—কোনো ভুল নেই।

মিকি—গোল চাকতি দুটো তুলে ধরলো চাঁদের আলোয়—সত্যি—কি চমৎকার, টাকা না মোহর? যাই হোক আর দেখতে হবে না, এবার তো—বড়লোক হয়ে গেলাম।

মনের আনন্দে মিকি লাফিয়ে লাফিয়ে বাসার দিকে ছুটে চললো হাতের ভেতর চাকতি দুটোকে নিয়ে।

মিকি হলো খেলাঘরের মস্ত বড় সাদা খরগোস।

বাড়িতে মিকি একলাই থাকে—ঘরকন্নার কোনো ঝঞ্ঝাট নেই তাই কাউকে যে এই আনন্দের খবরগুলো বলবে তারও উপায় নেই। একটা জায়গায় চাকতি দুটো রেখে দুচারটে লেটুস পাতা খেয়ে আধভাঙ্গা ইজি চেয়ারটায় গা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লো আর ভাবতে লাগলো এই চাকতি দুটো নিয়ে সে কি করবে! সে তো এখন বড়লোক হয়ে গেছে! দেশে যত ধনী লোক আছে—সে তাদের মধ্যে প্রায় একজন বলা যায়। কিন্তু তা'বলে আরো বড় হবার চেষ্টা করা হবে না তাতো নয়। এখন থেকে বেশি বড়লোক হবার চেষ্টাই তাকে করতে হবে। যে দুটো মোহর সে পেয়েছে সে দুটো সে খরচ করবে না—কারণ টাকা ভাঙ্গিয়ে খরচ চালাবার মত তার সংসার নয়। সে একলা। তাছাড়া রান্নাবান্না করতে তো হয়না—পাতা, ফল যা খাবার তা খেয়েই তার দিন চলে। এখন দেখতে হবে ঐ দুটো খরচ না করে আরো বাড়ানো যায় কি করে?

অনেকক্ষণ ধরে ভেবে ভেবে তার মাথায় একটা বুদ্ধি এলো—মিকি ভাবলো এক কাজ করি, আমি তো এমনি ঘুরে ফিরে গল্পগুজব করে বেড়াই, তা না করে কাজ করবো। বন্ধু-বান্ধব পাড়াপ্রতিবেশী সকলের —কাজ করে দেবো—তার বদলে পয়সা নেবো তাদের কাছ থেকে, এইভাবে কাজ করলেই কিছুদিনেই আমার বেশ পয়সা জমে যাবে আর আমিও বড়লোক হয়ে যাবো। এই সব ভেবে চিন্তে মিকি তার বাড়ীর সামনে একটা সাইন বোর্ড টাঙিয়ে দিল যাতে সবাই জানতে পারে আর সেও কাজ পায়। বোর্ডে লেখা হলো—

সবরকম কাজ যত্ন নিয়ে করা হয়—

ভিতরে অনুসন্ধান করুন।

বন্ধু বান্ধব—পরীর দল সব যখন মিকির বাড়ীর কাছ দিয়ে যেতো

সকলে দেখতো বোর্ডটা। আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লেখাটা পড়ে চলে যেতো। তারা মনে মনে ভাবতো মিকিটার এতদিনে সুবুদ্ধি হয়েছে, ফাঁকি দিয়ে না বেড়িয়ে উপকার করবে।

কয়েকদিন পরে একদিন রুণুর খেলাঘরের কাঠবেড়ালী এসে মিকিকে ডাকাডাকি করতে লাগলো। মিকি ভেতর থেকে বল্লে কি খবর এসো এসো ভেতরে। ভেতরে ঢুকে কাঠবেড়ালী গিন্নি দেখলো একটা টেবিলে কিছু কাগজপত্র ছড়ানো আর তার সামনে চেয়ার। মিকি একটা কাঠের কলমে কি সব লিখছে।

গিন্নি বল্লে—একটা কাজের জন্যে তোমার কাছে এলাম ভাই।

—বলো বলো।

আজ আমার বাড়ীতে কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবকে চা খেতে বলেছি। কিন্তু আরো দু'চার জনকে বলতে হবে, কিন্তু আমার তো যাবার সময় নেই। একটিও খাবার দাবার তৈরী হয়নি। চট্ করে যদি এই চিঠি ক'খানা নিয়ে গিয়ে এদের বাড়ী বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসো।

মিকি খুসী হয়ে বল্লে নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, আমি তো এইসব কাজ করবো বলেই সাইন বোর্ড দিয়েছি। চিঠি দিয়ে যাও, আমি এক ঘণ্টার মধ্যে সব পৌঁছে দেবো!

কাঠবেড়ালী গিন্নী খুসী হয়ে বল্লে আচ্ছা ভাই যাও তাহলে আর দেখো বিকেলে চা খেতে এসো কিন্তু, ভুলো না।

কাঠবেড়ালী গিন্নি চলে গেল আর মিকিও বেরিয়ে পড়লো চিঠি গুলো নিয়ে। তারপর সব কাজ সেরে বিকেলে চায়ের নেমন্তন্ন সেরে বাড়ী ফিরবার সময় মিকি কাঠবেড়ালী গিন্নির কাছে গিয়ে বল্লে কই, আমি তো এবার চল্লুম পারিশ্রমিকটা দাও।

পারিশ্রমিক? চমকে উঠলো কাঠবেড়ালী গিন্নি সে আবার কি?

—কাজ করলে তো পারিশ্রমিক চাই-ই, আর সেই জন্যেই তো সাইন বোর্ড লিখে দিয়েছি।

—তুমি নিশ্চয় পাগল হয়ে গেছ মিকি, তাই কাজ করে তার মূল্য চাইছো।

—না না মোটেই পাগল হয়নি, দাও তাড়াতাড়ি দাও একটা টাকা দিলেই হবে। মজুরী আমার চাই-ই!

—টাকা? একটা পয়সাই নেই—আমার। আর তুমি যে এমন নীচ হয়েছো তাতো জানতাম না—কি ব্যাপার তোমার।

—ওসব কথা রাখো আমার পয়সা চাই—রেগে গেছে মিকি।

কাঠবেড়ালী গিন্নি বললে: তুমি যে এমন হয়েছ তা জানিনা। খরগোসরা এমনি হয় বুঝি বড় হলে?

রেগে লাফ দিয়ে চলে গেল মিকি। আচ্ছা আচ্ছা দেখে নোবো—দূর থেকে কেবল একথাই শোনা গেল।

এর কয়েকদিন পরে—আবার তার তলব এলো, সাদা ইঁদুরদের বাড়ী থেকে। কর্তা বল্লে, 'মিকি তুমি এমন পরোপকারী হয়েছ তা ভাই শুনেই এসেছি। আজ আমার কিছু কাজ করে দিতে হবে। বাড়ীতে একটি উৎসব আছে, লম্বা ডাঁটাওয়ালা কি বলে খুব সুন্দর গন্ধ, তাই আজ চাই। আমার বড়মেয়ে বলেছে। সেই ফুল না হলে টেবল সাজানো যাবে না। কিন্তু—এতদূর থেকে আনতে হবে যে আমি যেতে পাচ্ছিনা, তাছাড়া এখন আর অত, ছুটোছুটি করতে পারিনা। তুমি যদি ভাই এনে দাও বড্ড উপকার হবে।'

—নিশ্চয় এনে দোব; দেখছেন না এসব কাজ করবো বলেই তো সাইন বোর্ড লিখে দিয়েছি, আচ্ছা আপনি যান আমি দুপুর বেলা যাবো সেখানে।

বেশ—বেশ বাবা। তাহলে জায়গাটাও তুমি চেনো? ইঁদুর কর্তা বল্লে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ চিনি বৈকি।

তারপর মিকি রজনীগন্ধা ফুল আনতে যাবে বলে বেরোতে গিয়ে দেখলো বিষ্টি পড়ছে—জল থৈ থৈ। হেঁটে চলা শক্ত মাথাও ভিজে

যাবে। বুদ্ধি করে ব্যাঙদের বাড়ী গিয়ে একখানা বড় দেখে ব্যাঙের ছাতা চেয়ে নিয়ে চললো ফুল আনতে। ছাতা মাথায় দিয়ে মিকি ফুল নিয়ে এলো তাই কোনো কষ্ট হোলো না আর ফুল পেয়ে ইঁদুর পরিবারও খুব খুসী। কর্তা বল্লে: ধন্যবাদ মিকি, খুব কষ্ট হয়েছে তোমার, চা খেয়ে যাও।

মিকি বল্লে: চা আমার দরকার নেই আমার মজুরীটা পেলে—

—মজুরী। আকাশ থেকে পড়লো ইঁদুর কর্তা সে কি হে? মজুরী মানে?

—মজুরী মানে কিছু পয়সা-কড়ি—মিকি ধরা গলায় বল্লে।

—পয়সা? তুমি অবাক করলে? তা আমরা কোথায় পাবো—ওসব কারবার আমাদের আছে নাকি?

—কিন্তু আমি কিছু চাই।

—চাই বল্লেই তো হলো না। ওসব কোথায় পাবো! খাবার দাবার হতো যোগাড় করে দিতাম।

মিকি চটে গেছে এবার—কাজ করাবে সবাই আর পয়সা দিতে চাইবে না। দূর থাকব না এখানে।

রাগ করে চলে গেল মিকি বাড়ীতে।

পরের দিন আবার এজকন এসে উপস্থিত হলো। রাত্তিরে যেসব পরীদের মেয়েরা খেলতে আসে তাদের একজন মিনতি করে বল্লে: ভাই মিকি আমায় একটু—ও পাড়ায় পৌঁছে দিয়ে এসো—আমার মাসতুত বোনের অসুখ করেছে। মা বল্লে তোমার পিঠে করেযেতে।

মিকির মেজাজ ভালো ছিল না। বল্লে মা না হয় বলেছে: কিন্তু তোমায় যে ঘাড়ে করে পৌঁছে দেবো কি দেবে? একটা টাকা দেবে?

—ওমা সে আবার কি? টাকা আবার কি? এটুকু উপকার তো সবাই করে থাকে—তুমি এমন অভদ্র হয়েছ কেন বলত?

—অভদ্র? পয়সা চাইলেই অভদ্র। আমার দু'টো টাকাকে—তিনটে, তিনটে থেকে চারটে করতে হবে না?

আর মজুরী না পেলে কে কাজ করে ?

পরী রেগে গেছে, বল্লে ওসব আমি জানি না, মা জানে, তুমি মার কাছে থেকে নিও।

মিকি তাকে পিঠে বসিয়ে সেই দূরে পৌঁছে দিল তার মাসীর বাড়ী। তারপর অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। বাচ্চা পরীর মা এসে বললে, মিকি তুমি নাকি টাকা চেয়েছ ? সে আবার কি ?

মিকি বললে, কাজ করলে মজুরী পাবো না। সেই দূর থেকে ঘাড়ে করে নিয়ে এলাম ওকে।

পরীর মা অবাক হয়ে বললে—সে আবার কি ? বন্ধু-বান্ধব পাড়া প্রতিবেশী এসব তো করেই থাকে তার জন্যে দাম নেয় না।

মিকি খুব চটে গেছে, তাই আস্তে আস্তে উঠে এলো। তারপর বাড়ীর রাস্তা ধরলে।

মনটা দমে গেছে মিকির। তাই পথে আসতে আসতে সে ভাবতে লাগলো দুনিয়াটাই এই—তাহলে কেউ কিছুই করলে দাম দিতে চায় না। মিকি পথে আসতে আসতে খুব ঝড় উঠলো আকাশ কাল হয়ে মেঘের বুক চিরে বিদ্যুৎ চমকাতে লাগলো—ক্রমশঃ পথ ঘাট অন্ধকার হয়ে গেল, দুম দাম করে গাছগুলো আছাড় খেয়ে পড়লো, ধুলোবালি উড়ে একেবারে তাণ্ডব লেগে গেল।

মিকি বাড়ীর কাছাকাছি এসেও বাড়ী পৌঁছতে পারলো না।

কিছু দেখা যাচ্ছে না, তাই একটা গাছের তলায় দাঁড়ালো—ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে, বৃষ্টির জলে না ভয়ে তা বোঝা গেল না। আর পড়বি তো পড়—গাছটা হুড়মুড় করে পড়লো ভেঙে মিকি চেপ্টে গিয়ে প্রাণপণে চীৎকার করতে লাগলো,....কিছুই বুঝতে পারলো না।

মিকি যখন চোখ তাকালো, দেখলো বিছানায় শুয়ে আছে। গায়ে চাপা হাতে পায়ে বেণ্ডেজ বাঁধা। কাঠবেড়ালী গিন্নি, ইঁদুর কর্তা,. পরীদের একটা মেয়ে, সবাই তাকে পরিচর্যা করছে। গিন্নি মিকিকে তাকাতে দেখে বললে, এখন কেমন আছ মিকি ? ষাঁড়টা

কিন্তু ছেড়ে গেছে। কর্তা বললে, যে রকম চিঁড়ে চ্যাপটা হয়ে গিয়েছিল, আমি তো ভাবিনি ও আবার বাঁচবে—ভগবানের দয়া। অমন সাদা ধবধবে রং কাদায় মাখা হয়ে গেছে।

পরীর মেয়ে বল্লে, এখন ভালই আছ মনে হচ্ছে। কি বল মিকি?

মিকি ঘাড় নেড়ে জানালো একটু ভাল বোধ করছে।

তারপর কয়েকদিন পরে সে সুস্থ হয়ে উঠলো। এ কয়দিন কাঠবেড়ালী গিন্নি, ইঁদুর কর্তা, পরীর মেয়েরা, তাকে খুব যত্ন করে ওষুধ পথ্যি দিয়ে ভাল করে তুললো। এদের যত্নে মিকির মন কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠলো। মনে মনে ভাবলে এরা তার জীবন বাঁচালো আর সে কিনা কাজ দিয়ে দাম চেয়েছিল? লজ্জা হলো মিকির।

তারপর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে একদিন সে দু'খানা খামে সেই চাকতি দুটো দিয়ে নাম ঠিকানা লিখে কাঠবেড়ালী গিন্নি আর ইঁদুর কর্তার বাড়ীর লেটার বক্সে উপহার বলে লিখে ফেলে দিয়ে এলো। আর অতদূরের পথ ভেঙ্গে গোছা চার-পাঁচ রজনীগন্ধা এনে পরীদের বাড়ী পাঠিয়ে দিল। আর নিজের বাড়ীর দরজা থেকে সাইনবোর্ডটা খুলে ফেলল।

এখন যদি তোমরা মিকিকে দেখ, দেখবে সে সকলের কাজ হাসিমুখে করে দেয়—দামের কথা ভুলেও তোলে না। আর সে যখন জানালার ধারে চুপ করে বসে থাকে তখন কি যেন ভাবে। কি ভাবে তা তোমরা জানো? জানো না? আমি জানি! সে ভাবে পরীর সেই কথাটা—"বন্ধু-বান্ধব পাড়াপ্রতিবেশী সকলেরই উপকার করতে হয়, তার জন্যে দাম নিতে হয় না।"

—শেষ—